Acc. No. 172 Shelf No. A 1 4 L 4

Title
SubTitle Gīti sāhitye Bhaktivinoda

✓
Role [Author] [Editor] [Comment.] [Transl.] [Compiler] [ ]
Sundarananda Vidyavinoda

Edition

Publisher Nisikanta Sanyal

Place Mayapur Year 1938 Ind.Yr. 1345

Lang. Bengali Script Bengali

Subject

P.T.O. ➡

গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

মহামহোপদেশক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-

বিরচিত

[বার আনা]

প্রকাশক—

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল, এম্-এ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

প্রাপ্তিস্থান—

ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউট্

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ইউনিয়ন প্রেস

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠ

বড়বাজার, ময়মনসিংহ

মুদ্রাকর—শ্রীরমেশচন্দ্র দে সরকার

ইউনিয়ন প্রেস, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে ।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপোদ্ঘাত

নিগমকল্পতরুর গলিত-ফল শ্রীমদ্ভাগবতকে মূল অবলম্বন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার আশ্রিত শ্রীগদাধর-দামোদর-স্বরূপাভিন্ন-বান্ধব ষড়্‌গোস্বামি-প্রভু ও তদনুগত গৌড়ীয়াচার্য্যগণ নিঃশ্রেয়স-প্রার্থী জীবের জন্য যে প্রণালীতে পরম সম্বন্ধ, পরম অভিধেয় ও পরম প্রয়োজনের কথা স্বকৃত গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ ও আচার-প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রণালীর অনুসরণে সমগ্র মানবজাতির নিত্য চরম ও পরম কল্যাণ-বিধানের উদ্দেশ্যে পরম করুণাময় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সহজ ও সরল বঙ্গভাষায় তাঁহার গীতি-গুচ্ছ রচনা করিয়াছেন। গোস্বামিপাদগণের সিদ্ধান্তরাজি দুরবগাহ সংস্কৃত-ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকায় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তাহা অনুশীলন ও ধারণা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ বঙ্গভাষায় বিশেষতঃ গীতি-ছন্দে তাহা প্রকাশ করায় সেই সকল রহস্য সংস্কৃত-ভাষানভিজ্ঞ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুলভ হইয়াছে। এই সব গীতি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে ও হইতেছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই মহা-দানের তুলনা আর নাই। বাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সকলেই শ্রদ্ধালু হইয়া ঠাকুরের এই সকল গীতি শ্রবণ, সুপঠন ও বিচার করিলে অবিদ্যা, অচেতনতা বা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হইতে সহজেই উদ্ধার লাভ করিয়া বিদ্যার সাহায্যে ব্রহ্ম-পরমাত্ম-জ্ঞান-লাভের অন্তে ভগবজ্‌জ্ঞানে জ্ঞানী ও ভগবদ্ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে এই সকল গীতির

শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে অনুশীলনের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গ আর কিছুই নাই। যাঁহারা সুকণ্ঠ, তাঁহারা এই সকল গীতি সুর-তানাদির সহিত কীর্ত্তন করিতে পারেন ; গানের শক্তি না থাকিলেও অর্থাৎ সুর-তানাদি না জানিলেও অনুগমন, অনুমোদন, দৈন্য, আর্ত্তি, বিজ্ঞপ্তি ও লালসার সহিত এই সকল গীতি কীর্ত্তন করিলে ভজনরাজ্যে নিশ্চয়ই অগ্রসর হইয়া সাধ্য-ভক্তি লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের এই সকল গীতির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা কৃষ্ণ-বিমুখ কোন জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ না করিয়া একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের তর্পণ বিধান করিয়াছেন। প্রত্যেকটি গীতির মধ্যে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত ও ভজন-রাজ্যে অগ্রসর হইবার চরম উপদেশ-সমূহ নিহিত রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথি-পূজার উপায়নরূপে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু এই উপাদেয় গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার উপর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তদভিন্নবিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুপ্রসাদ-বারি-ধারা চিরদিনই বর্ষিত—ইহা সকল নিরপেক্ষ সুধীই জানেন।

"গীতি-সাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ" গ্রন্থে তিনি শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-বর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্ত ও উপদেশ-সমূহ সমালোচনামুখে উদ্‌ঘাটন করিয়া আমাদের ন্যায় অনর্থগ্রস্ত ভগবদ্‌বিমুখ জীবের বিষয়-ভোগ-ত্যাগ-ধূলি-মলিন চিত্তকে পরিমার্জ্জন-পূর্ব্বক 'ভূরিদ'-সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীরূপের 'নামাষ্টকে'র সর্ব্বশেষ (অষ্টম) শ্লোক-অবলম্বনে ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ তাঁহার গীতাবলীতে গাহিয়াছেন—

"নারদমুনি, বাজায় বীণা,
রাধিকারমণ-নামে।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীত-সামে॥"

শ্রীরূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারায় যে শ্রীরাধিকারমণ-নামের রাস হয়, তাহাতে শ্রীনারদের জিহ্বায় অভিন্ন-বাচক নামী-প্রণবরূপী বাচক-কৃষ্ণনাম ও শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর বীণা-যন্ত্রে শ্রীরাধিকা-নাম প্রকটিত হন। এই রাসে শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী মহতী বীণা বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীনারদরূপী পণ্ডিত শ্রীবাসের অঙ্গনে বা শুদ্ধ জীবাত্মার নির্ম্মল-হৃদয়ে এই নিত্য-সঙ্কীর্ত্তন-রাসের নৃত্য-কীর্ত্তন হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-উপলক্ষে ভক্তিবিনোদ-বাণীর শ্রীচরণ-কমলে এই দীন হীন কাঙ্গালের আন্তরিক প্রার্থনা—সকল জীব-হৃদয় সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বরূপে প্রকাশিত হইয়া শ্রীবাস-অঙ্গন-রাসস্থলীরূপে পরিণত হউন। তাহাতে রাধিকারমণ-নামের নিত্য-বিলাস হউক, শ্রীনামরূপ-গুণ-লীলা-সঙ্কীর্ত্তন-রাসে সকল জীব যোগদান করুন। সমগ্র জীবজাতির (নারের) গুরুদেব যিনি, তাঁহারই নাম—'নারদ' (জীবসমষ্টি বা 'নার'কে যিনি কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রদান করেন), সেই শ্রীনারদ-ব্যাসাভিন্ন শ্রীভক্তি-বিনোদ-সরস্বতীর বীণা-যন্ত্রে প্রকটিত গীতিতে সকলে যোগদান করিয়া রাধিকারমণ-নামের সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে এই অযোগ্য দীন হীন

কাঙ্গালকে দোহার করিবার যোগ্যতা, শক্তি ও সুবুদ্ধি প্রদান করুন।

একদিন স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রশ্নকর্ত্তৃরূপে ও শ্রীরামানন্দ প্রভু বক্তৃরূপে এই কথা বলিয়াছিলেন—

(প্রভু কহে—) "সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস ?"

(রায় কহে—) "শ্রীবৃন্দাবন-ভূমি—যাঁহা নিত্যলীলা-রাস ॥"

—(চৈঃ চঃ ম ৮।২৫৪)

যেখানে রাহিত্য নাই, যেখানে গীতি-সাহিত্যের স্বচ্ছন্দ বিলাস, তাহাই রাসক্ষেত্র। "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্" —এই সঙ্কীর্ত্তনই 'সংহিতা' বা 'সহিতা'। বেদের সংহিতা-সমূহ তথা 'ব্রহ্মসংহিতা', 'কৃষ্ণসংহিতা' এই সঙ্কীর্ত্তন-রাসের কথাই গাহিয়াছেন। বেদের 'সূক্ত'সমূহের অর্থও (সু+উক্ত=সূক্ত) সুকথিত, সুকীর্ত্তিত বা সুগীত। "ভকত-গীত-সামে"—সূক্ত-সমূহ বা গীতি-সাহিত্য-সমূহের দ্বারা রাধিকারমণ-নামেরই রাস হইয়া থাকে। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর বীণা-বাদিত গীতির দোহার করিবার জন্য কবে আমরা সেই নাম-সঙ্কীর্ত্তন-রাসে প্রবেশাধিকার-লাভ করিব ? সেই অকপট আর্ত্তির কণা শ্রীরূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর পাদপদ্মে অধম অযোগ্য আমি পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণববৃন্দ কৃপা করুন।

শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর তিরোভাব-তিথি
গৌরদ্বাদশী, বাং ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৫
ইং ৭ই আগষ্ট, ১৯৩৮, গৌরাব্দ ৪৫২
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর
কৃপাবিন্দু-প্রার্থী
শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

"গীতি-সাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ" গ্রন্থ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভুবনপাবনী শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথি-পূজার একটী উপায়নরূপে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর অহৈতুকী কৃপায় প্রকাশিত হইল।

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারায় অবগাহন করিয়া যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীরাধা-মাধব ও শ্রীরাধা-মাধবে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা দর্শন ও আস্বাদন করিবার জন্য অকপট অভিলাষী, তাঁহারা ঠাকুরের গীতি-সাহিত্য পাঠ করিয়া তাঁহার অনর্পিতচর অবদানের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থে "শোক-শাতন", "বাউল-সঙ্গীত" ও "দালালের গান" প্রভৃতি যে 'গীতমালা'র অন্তর্গত বলিয়া সমালোচিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে "গীতমালা" গ্রন্থের অন্তর্গত হইবে না। 'শোক-শাতন', 'বাউল-সঙ্গীত' ও 'দালালের গান' প্রত্যেকটি পৃথক্ গীতিগুচ্ছ। সুধী পাঠকগণ কৃপা-পূর্ব্বক এই প্রমাদটী সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মহিম-সিন্ধু অনন্ত, অতল ও দুরবগাহ। অসংখ্য অনর্থগ্রস্ত এই ক্ষুদ্র জীব-কীট তাহা কি করিয়া স্পর্শ করিবে? তবে পরমারাধ্য আচার্য্যদেব ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের

আদেশে ও নিত্যানুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-বাণী স্মরণ করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সেবার আভাস-লাভের আকাঙ্ক্ষায় এইরূপ দুরূহ-কার্য্যে সাহসী হইয়াছি। এই গ্রন্থে অনেক ত্রুটী-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে; অদোষ-দর্শী সজ্জনগণ ইহা হইতে সার গ্রহণ করিবেন, এই ভরসা করিয়াই এই গ্রন্থ তাঁহাদের করকমলে অর্পিত হইল।

শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশী
২১শে শ্রাবণ, ১৩৪৫
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার,
কলিকাতা

শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণকৃপাকণাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীতিসাহিত্যে ভক্তিবিনোদ

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

ধর্ম্ম-নীতি, সমাজ-নীতি, অর্থ-নীতি, পরমার্থ-নীতি ও রাষ্ট্র নীতির বিপ্লবময় যুগে; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-ভাব-ধারার বিনিময় ও সংঘর্ষের সন্ধিক্ষণে; নূতন পৃথিবী ও নূতন যুগের আবর্ত্তন-কালে যিনি ভগীরথের ন্যায় পতিতপাবনী সুনির্ম্মলা ভক্তিগঙ্গাকে এই শুষ্ক মরুভূমি-তুল্য ধরাতলে পুনরায় প্রবাহিত করিয়াছেন, সেই গৌর-শক্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রপঞ্চা-বতরণ কালের শতবর্ষ পূর্ণ হইল। এই ভুবনমঙ্গল-অবসরে আমরা ভক্তিবিনোদের বিচিত্রতরঙ্গা লীলাময়ী গীতি-গঙ্গা হইতে দুই এক অঞ্জলি অর্ঘ্য আহরণ করিয়া আচার্য্যের পৌরোহিত্যে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিবার আশা পোষণ করিতেছি। ভক্তিবিনোদ-

গৌর-সরস্বতী যদি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেবায় অধিকার প্রদান করেন ও ঐ সেবা প্রসন্ন হইয়া স্বীকার করেন, তবেই আমরা আমাদের এই স্বপ্নকে কথঞ্চিৎ বাস্তবতায় পরিণত করিতে সমর্থ হইব। তাই আদি, মধ্য ও অন্ত্য—সর্ব্বত্র ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর কৃপার আরতি যাচ্ঞা করিতেছি।

"কানু ছাড়া গীত নাই"। কানুর গীতই গীত, আর অন্যগুলি প্রজল্প বা ভেক-কলরব। শ্রুতিতে যে রসস্বরূপ শবল-ব্রহ্মের উদ্‌গান; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতির গীতি; শ্রীমদ্ভাগবতে যে পরমহংসগণের কৃষ্ণগান; শ্রীশিক্ষাষ্টকে যে শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তন; শ্রীগীতগোবিন্দে যে জয়দেব-সরস্বতীর গীত; শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে যে বিল্বমঙ্গলের গান; শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে যে গুণরাজ খানের ভাগবতী গীতি; চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামরায়, স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, কবিরাজ, ঠাকুর নরোত্তমের গৌর-বিহিত ও গৌরকর্ণামৃতস্বরূপ যে গীতিসমূহ গীত হইয়াছে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-সাহিত্যে সেই সকল গীতির ঐকতান-মহোৎসব ও অধিকতর মধুর মূর্চ্ছনা প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ভক্তিবিনোদের গীতি-সাহিত্য রূপানুগ ভজনামৃতের প্রস্রবণ। ভক্তিবিনোদ তাঁহার গীতি-নির্ঝরিণী হইতে জগৎকে অফুরন্ত কল্যাণামৃত দান করিয়াছেন। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সাগরের বিপুল জলরাশি যদি মসি হইত, আর তথাকার পর্ব্বতরাজি যদি লেখনী হইত ও স্বয়ং গণেশ যদি লেখক হইতেন, তথাপি ভক্তি-বিনোদের অবঞ্চনাময়ী করুণার কথা লিখিয়া শেষ করা যাইত না।

এ কথা একটুও অতিরঞ্জিত নহে। যদিও গৌড়-সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের গীতাবলীতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তথাপি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার গীতি-সাহিত্যে অনর্থ-যুক্ত জীবের জন্য ঔদার্য্য-ঝঙ্কারে সম্বন্ধজ্ঞান-তত্ত্বের যেরূপ বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন, প্রতি পদে শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জনের লীলাটি যেরূপভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অদ্বিতীয় ও অভূতপূর্ব্ব।

"হিতেন প্রাণিনামবিদ্যা-মোচন-রূপোপকারেণ সহ বর্ত্তমানা 'সহিতা' ভগবদ্‌ভক্তি-স্তামর্হতীতি সাহিত্যং শ্রীভাগবতঞ্চ" অথবা "সহিতস্য ভগবৎসঙ্গস্য ভাবঃ সাহিত্যম্।"

অর্থাৎ প্রাণিগণের অবিদ্যামোচনরূপ উপকারের সহিত যাহা বর্ত্তমানা, তাহাই 'সহিতা'। সেই 'সহিতা' অর্থ—ভগবদ্‌ভক্তি। ভগবদ্‌ভক্তি প্রতিপাদন করিবার যোগ্যবস্তুই 'সাহিত্য'। সেই সাহিত্যই—'ভাগবত'। অথবা 'সহিত' অর্থাৎ ভগবৎসঙ্গের যে ভাব, তাহার নামই সাহিত্য।

সাহিত্য স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের—চিল্লীলামিথুনের নব-নবায়মান চিদ্বিলাসের সেবা করিয়া থাকে। রাহিত্য বা নির্ব্বিশেষ ভাবকে এবং জড়বিলাসকে নিরাস করিয়া সাহিত্য "রসো বৈ সঃ" ও "সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু"র লীলাকৈবল্যের গান করিয়া থাকেন। ভক্তিবিনোদের গীতি-সাহিত্য ঐরূপ তাৎপর্য্যেরই উপমান-স্বরূপ।

ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি', 'কল্যাণকল্পতরু', 'গীতমালা', 'গীতাবলী', 'ভজনরহস্য' প্রভৃতি গীতি-গ্রন্থে যে-সকল ক্লেশঘ্নী,

শুভদা, মোক্ষ-লঘুতাকারিণী, সুদুর্ল্লভা, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও কৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তিগীতি গান করিয়াছেন, তাহাই আমরা শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের গীতি-বিদ্যা-বিশারদ আচার্য্যের মূল গায়কত্বের অনুগমনে এই পুস্তিকায় অনুশীলন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই গীতি-সাহিত্যের শব্দব্রহ্মে ভক্তিবিনোদের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা অকপট-আনুগত্যধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া সেবোন্মুখ হইতে পারিলেই ভক্তিবিনোদের শব্দাবলীর মধ্যে তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার অবতার তাঁহার প্রপঞ্চাবতরণ-লীলার শতবর্ষ পরেও নামাঞ্জনচ্ছুরিত-চক্ষুতে দর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারিব।

শরণাগতি

গীতার চরম শিক্ষা—শরণাগতি। শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'তে শরণাগতির সর্ব্বোত্তমাবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার আদর্শ-চরিত্রে ও শিক্ষায়, শরণাগতি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধে ও তাঁহার স্বরচিত গীতি-গ্রন্থে শরণাগতির ষড়্‌বিধ লক্ষণের অভূতপূর্ব্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-কথিত শরণাগতির ছয়টি লক্ষণের মধ্যে "কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ"ই শরণাগতির 'অঙ্গী' ও অন্যান্য পাঁচটিকে 'অঙ্গ' বলিয়াছেন। যাঁহারা কৃষ্ণকে একমাত্র পালয়িতা বলিয়া বরণ করেন নাই বা তদ্বিষয়ে যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূনতা আছে, তাঁহারা পূর্ণ শরণাগত নহেন। সেই অদ্বিতীয় গোপ্তা কৃষ্ণের গোপীগণ পূর্ণশরণাগত। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি'-গীতির প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীবের প্রতি দয়াবিশিষ্ট হইয়া অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম দান করিবার জন্য নিজ-পার্ষদ ও নিজ-ধামের সহিত অবতীর্ণ হইয়া ভক্তগণের জীবনস্বরূপ শরণাগতি শিক্ষা দিয়াছেন। কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ, দৈন্য, আত্মনিবেদন, কৃষ্ণ অবশ্য রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস, ভক্তির অনুকূল স্বীকার ও ভক্তির প্রতিকূল বর্জ্জন—শরণাগতির এই ছয় প্রকার ভেদ। ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন,—

"ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥"

আমরা ভগবান্‌কে তাঁহার নামের দ্বারা যে আহ্বান করি, সেই প্রার্থনা-সূচক নাম শরণাগত ব্যক্তির নিকটেই ফলদায়ক হয়। শরণাগতি ব্যতীত ভগবান্ কাহারও আহ্বানে সাড়া দেন না। অনেক সময় আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া মনে করি, ভগবান্‌কে অনেক ডাকিয়াছি, কিন্তু তিনি আমাদের ডাক শুনিতেছেন না! আমরা কতটা শরণাগত হইতে পারিয়াছি, তাহা একটুও তলাইয়া দেখি না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরূপ-সনাতনকে "শরণাগতির শিক্ষক" বিচার করিয়া তাঁহাদের নিকট শরণাগতি যাচ্ঞা করিয়াছেন—

"রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুই পদ ধরি॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম॥"

শরণাগত ব্যক্তি শ্রীরূপ-সনাতনের কৃপায় 'ভাল আমি' হন, 'বড় আমি' হইতে চাহেন না। এইজন্যই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—

"কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহ উত্তম॥"

শ্রীরূপানুগ-গণ 'ভাল আমি' হইবার বিচারে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা 'সর্ব্বোত্তম' হইয়াও 'বড় আমি' হইতে চাহেন না।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কায়িক, বাচিক ও মানসিক-ভেদে শরণাগতির ছয় প্রকার বিভাগ করিয়াছেন। ছয় প্রকার শরণাগতিই

কায়িক, বাচনিক ও মানস-ভেদে তিন তিন প্রকার। শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শরণাগতি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"ষড়্‌বর্গান্তরিকৃতসংসারভয়বাধ্যমান এব হি শরণং প্রবিশত্যনন্য গতিঃ। ভক্তিমাত্রকামোঽপি তৎকৃতভগবদ্বৈমুখ্যবাধ্যমানঃ। অনন্য-গতিত্বঞ্চ দ্বিধা দর্শ্যতে। আশ্রয়ান্তরস্যাভাবকথনেন নাতিপ্রতজ্জয়া কদাচিদাশ্রিতস্য অপ্যন্যস্য ত্যজনেন চ।" (ভক্তিসন্দর্ভ, ২৩৬ সং)

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি ছয় রিপু-কৃত সংসার-ভয় পর্য্যালোচন-পূর্ব্বক ভাগ্যবান্ জীব অনন্যগতি হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপন্ন হন। যাঁহার কেবল শুদ্ধভক্তিমাত্রই কামনা, তিনিও তদ্দ্বারা ভগবদ্বৈমুখ্য আশঙ্কা করতঃ আপনাকে অনন্যগতি মনে করেন। অনন্যগতিত্ব দুই প্রকার—এক প্রকার অনন্যগতি এই যে, আশ্রয়ান্তর না পাইয়া এইরূপ বলেন—"হে কৃষ্ণ! আমি সংসার-সুখ, কর্ম্ম ও তৎফলরূপ ভোগ এবং জ্ঞান ও তৎফলরূপ মুক্তি উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম, চিৎস্বরূপ আত্মা যে আমি, আমার আর তোমার অভয় পদ ব্যতীত কোন প্রকৃত আশ্রয় নাই। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম।" দ্বিতীয় প্রকার অনন্যগতিত্ব এইরূপ—"হে কৃষ্ণ! আমি কর্ম্মকাণ্ডকে আশ্রয় মনে করিয়া তদ্যোগ্য দেবতা আশ্রয় করতঃ কত কোটি কোটি জন্মে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, যজ্ঞ ও ব্রতাদি করিয়া দেখিলাম, তাহাতে কোন-প্রকার নিত্যানন্দ নাই। পুনরায় জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পদাশ্রয় করতঃ মুক্তির আস্বাদন দ্বারা দেখিলাম—তাহাতেও চিদানন্দ নাই। এই সমস্ত অবস্থার পর, হে নাথ! আমি সেই

সেই আশ্রয়-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এখন তোমার অমৃতপদ-চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।”

অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে যখন জীবের শ্রদ্ধা হয়, তখন জীব এই সঙ্কল্প করেন যে, আমি কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সমস্ত বিষয় স্বীকার করিব। অনুকূল বিষয় স্বীকার না করিলে ভক্তি অনুশীলন কিরূপে হইতে পারে? সংসারে আবদ্ধ হইয়া বিষয়-ধ্যানে জীবন কাটাইতেছি। সেই সকল বিষয়-ধ্যান আমাকে বিষয়ে পুনঃ পুনঃ গাঢ়রূপে আবদ্ধ করিতেছে। অতএব কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহা হয়, তাহাই মাত্র অঙ্গীকার করিলে ভক্তির অনুশীলন হইবে এবং ক্রমশঃ বিষয়-বন্ধন ক্ষয় হইয়া পড়িবে। শ্রীজীব গোস্বামি-প্রদর্শিত প্রথা-অনুসারে কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ আনুকূল্যের পৃথক্ আলোচনা করিতেছি। পঞ্চবিধ যথা—

১। রসনাগত, ২। কর্ণগত, ৩। চক্ষুগত, ৪। হস্ত-পদাদি-শরীর-গত, ৫। ঘ্রাণগত।

রসনাকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ ও ভক্ত-প্রসাদ-সেবন-ব্রতই একমাত্র উপায়। প্রসাদ সেবার সময় ভোগসুখ মনে হয় না, কেবল জীবননাথ শ্রীকৃষ্ণের ভোজন-সুখই মনে পড়ে। প্রসাদ-সেবার সময় স্বীয় ভোগসুখ মনে করিলে আর আনুকূল্য ভাব থাকে না।

চক্ষুকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, বৈষ্ণব-দর্শন, ভগবল্লীলাস্থানের বিবিধ শোভা-দর্শন এবং লীলা-প্রতিকৃতি ইত্যাদি দর্শন-ব্রতই একমাত্র উপায়। যাহা কিছু চক্ষুর বিষয়ীভূত হয়, তাহাতে ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করাই মূল প্রয়োজন।

ঘ্রাণকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণার্পিত তুলসী, পুষ্প-চন্দনাদির ঘ্রাণ-গ্রহণ-ব্রতই একমাত্র উপায়। যে-কিছু গন্ধ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা কৃষ্ণ-সম্বন্ধের সহিত গ্রহণ করা উচিত,—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥

(ভাঃ ৩।১৫।৪৩)

সনক-সনাতনাদি পূর্ব্বে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মালোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, কিন্তু যখন কৃষ্ণপাদপদ্মকিঞ্জল্কমিশ্র তুলসীগন্ধ নাসিকা-বিবর দ্বারা অন্তর্গত হইল, তখন ভক্তিজনিত বিকার উদিত হইতে লাগিল।

কর্ণকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে হরিকথা, ভক্তকথা ও হরিসম্বন্ধিনী বিষয়কথার শ্রবণ-ব্রতই একমাত্র উপায়; যথা—

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ॥

(ভাঃ ৩।১৫।২৫)

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেবগণ! যাঁহারা পরস্পর হরিকথার আলাপ করিতে করিতে ভক্তিবিকার লাভ করেন, তাঁহারা আমাদের উপরিস্থ নিত্যধামে যাইতে সক্ষম।

হস্তপদাদি শরীরকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে তত্তৎশরীর দ্বারা ভগবৎসেবা ও বৈষ্ণবসেবাই একমাত্র উপায় ; যথা—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজ-সৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

(ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

যেরূপে কৃষ্ণভক্তগণের শুদ্ধা রতি হয়, সেইরূপে তিনি কৃষ্ণ-পাদপদ্মে মনঃ, কৃষ্ণগুণানুবর্ণনে বাক্য, কৃষ্ণমন্দির-মার্জ্জনাদিতে কর, কৃষ্ণকথায় কর্ণ, কৃষ্ণমূর্ত্তি ও মন্দিরাদির দর্শনে চক্ষু, কৃষ্ণদাসাঙ্গ-স্পর্শনে স্পর্শেন্দ্রিয়, কৃষ্ণপাদপদ্মগত তুলসী-সৌরভে ঘ্রাণ, কৃষ্ণার্পিত-বস্তুতে রসনা, কৃষ্ণলীলাস্থলী-ভ্রমণে পাদদ্বয়, কৃষ্ণপাদাভিবন্দনে মস্তক ও ভোগেচ্ছাশূন্যকৃষ্ণদাস্যে কাম নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এইপ্রকার উপায়েই কৃষ্ণে স্থিরচিত্ত হওয়া যায়; যথা শ্রীগোস্বামি-বাক্য—

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি বৈ।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারজীবচঞ্চলে॥

যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়াধিপতি কৃষ্ণে স্থিরতা লাভ করে, তিনিই এই চঞ্চল সংসারে ধৈর্য্য লাভ করিতে সক্ষম।

এইপ্রকার কায়িক শরণাপত্তি হইয়া থাকে; মানসিক শরণাপত্তি তিন প্রকার, যথা— (১) ধ্যানগত, (২) বিচারগত, ও (৩) আস্বাদনগত।

মনের কার্য্য—ধ্যান ও বুদ্ধির কার্য্য—বিচার। সকল চিন্তা, সকল বিচার এবং সমস্ত আস্বাদন ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে তত্তৎ মানস-ব্যাপারসকলে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত।

ব্যবহারিক সমস্ত কথালাপ, গীত ও কাব্যাদি কৃষ্ণ-সম্বন্ধযুক্ত করিতে পারিলে আনুকূল্য সিদ্ধি হয়; যথা তন্ত্রে—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

"হে কৃষ্ণ! 'আমি তোমার'—এইরূপে বচনের ও মানসবৃত্তির দ্বারা এবং কৃষ্ণলীলাস্থলী-সমাশ্রিত শরীরের দ্বারা শরণাগত পুরুষ আনন্দ লাভ করেন।

প্রাতিকূল্য-বর্জ্জনই শরণাগতির দ্বিতীয়াঙ্গ। ইহাও কায়িক, বাচিক ও মানসিক-ভেদে ত্রিবিধ। "ভগবৎ-ভাগবত-প্রসাদ ব্যতীত

কিছুই ভোজন করিব না, ভগবৎ-ভাগবত-রূপ মন্দির ও স্থানাদি ব্যতীত আর কিছুই দেখিব না, প্রসাদ-গন্ধ ব্যতীত আর কিছুই ঘ্রাণ লইব না, ভগবৎ-ভাগবত-কথা ব্যতীত আর কোন কথা শুনিব না, হস্তপদাদি-বিশিষ্ট শরীরকে ভগবৎ-ভাগবত-সম্বন্ধ-শূন্য ব্যাপারে নিযুক্ত করিব না, তদ্ব্যতীত কিছুই ধ্যান, বিচার ও আস্বাদন করিব না, তদ্বিষয় ব্যতীত অন্য কাব্য-গীতাদি বলিব না"—এইরূপ সঙ্কল্পই প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন। ফলতঃ ভগবদ্ভক্তি-সাধনের যাহাই প্রতিকূল হয়, তাহাই বর্জ্জনীয়। সংসারস্থিত পুরুষের পক্ষে এই ব্যাপারটী বড়ই কঠিন। যতদূর হইতে পারে, ইহার অনুষ্ঠানে যত্ন না করিলে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে-সকল কথা আছে, তাহা সংক্ষেপে সংগ্রহ করিতেছি ; যথা পাদ্মে—

অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ।
অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্বমাংসসদৃশং ভবেৎ ॥

অবৈষ্ণব-প্রদত্ত অন্ন, পতিত লোকের এবং কৃষ্ণে নিবেদিত হয় নাই—এইরূপ অন্ন কুক্কুর-মাংস-তুল্য পরিত্যাজ্য। ভাগবতেও—

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে ॥

অসৎব্যক্তির সহিত কদাচ সঙ্গ করিবে না। পাপাচারী ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ সহজেই অসৎ। পুণ্যবান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ লোকের মধ্যে যাহারা কৃষ্ণভক্তিশূন্য ও বৈষ্ণববিদ্বেষী, তাহাদেরও সহিত

সঙ্গ করিবে না ; কেন না, উহারাও অত্যন্ত অসৎ। অসৎসঙ্গ করিলে সর্ব্বার্থহানি ও অধঃপতন হয়—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥
(ভাঃ ৩।৩১।৩৫)

অন্য বিষয়ে আসক্তিতে জীবের ততদূর মোহ ও বন্ধ হয় না—যত কামিনীতে আসক্তি ও কামিনীতে আসক্ত পুরুষের আসক্তিতে হয়।

"কৃষ্ণ আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন"—এই বিশ্বাসটী শরণাপত্তির তৃতীয়াঙ্গ। অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
(গীঃ ৯।৩১)

হে কৌন্তেয়, তুমি আমার এই প্রতিজ্ঞা সকলকে (নিজে প্রতিজ্ঞা করিয়া) জানাও যে, আমার ভক্তের কখনও নাশ হইবে না। কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ আপন-ধর্ম্ম-বলে আপনাকে রক্ষা করিবে ; কিন্তু আমার ভক্তের পদস্খলিত হইলেও আমি তাহার রক্ষাকর্ত্তা। শরণাগত লোক এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করেন।

"শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র পালয়িতা"—এইরূপ বুদ্ধি শরণাগতির চতুর্থ অঙ্গ। "অন্য মনুষ্য আমাকে পালন করেন বা আমি অর্জ্জন করিয়া আপনাকে পালন করি"—এই বুদ্ধি অতিশয় নিকৃষ্ট। কৃষ্ণ অনুকূল না হইলে কেহ আমাকে পালন করিতে এবং আমিও স্বয়ং অর্জ্জন করিতে পারিব না। অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত আমার আর কেহ পালনকর্ত্তা নাই।"

জীবের আত্মনিবেদনই শরণাগতির পঞ্চমাঙ্গ। "আমি কেহই নই, আমি যত কিছু 'আমার' বলিয়া বলি, সমস্ত কৃষ্ণের; আমি কৃষ্ণের সংসারে দাসমাত্র; কৃষ্ণের ইচ্ছাই প্রবল; আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নিরর্থক; কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত থাকাই আমার স্বভাব; মূর্খতা বশতঃ এ পর্য্যন্ত যে-সকল বস্তু ও ব্যক্তিতে 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া বুদ্ধি ছিল, তাহা আমি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম; আজ হইতে আমি—আমার নই, কৃষ্ণের"—এই বুদ্ধির নাম আত্ম-নিক্ষেপ।

কার্পণ্য বা দৈন্যই শরণা গতির ষষ্ঠ অঙ্গ। "আমি চিন্ময় জীব নিজ-কর্ম্ম-দোষে সংসারে নানা ক্লেশ ভোগ করিতেছি; আমি দণ্ডের উপযুক্ত পাত্র, কৃপাময় কৃষ্ণের নিত্যদাস হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয়ের বিস্মৃতি-বশতঃই আমার কর্ম্মচক্রে প্রবেশ ও এত ক্লেশ; আমার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? আমি সকল অপেক্ষা হীন, দীন ও অকিঞ্চন।"

এবম্ভূত ষড়ঙ্গ শরণাগতির দ্বারা যাঁহার চিত্ত নির্ম্মল ও চরিত্র পবিত্র হয়, তিনি শুদ্ধভক্তির একমাত্র অধিকারী।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি' গীতিতে শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট শরণাগতির প্রার্থনা করিয়া শরণাগতির অধিকারীর কিরূপ দৈন্য ও নির্ব্বেদ উপস্থিত হইবে, তাহা "সংসারে আসিয়া" প্রভৃতি গীতিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শরণাগতির পঞ্চম গীতিতে অননুকরণীয় ভাষায় সাংসারিক জীবের অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন—

আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ॥
নিজ-সুখ-লাগি, পাপে নাহি ডরি,
দয়াহীন স্বার্থপর।
পরসুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পরদুঃখ সুখকর॥
অশেষ কামনা, হৃদিমাঝে মোর,
ক্রোধী দম্ভ-পরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসা-গর্ব্ব-বিভূষণ॥
নিদ্রালস্য হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভ-হত সদা কামী॥

শরণাগতির প্রথম লক্ষণ—আত্মগ্লানি বা কার্পণ্য; তাহা শরণাগতির ৬, ৭, ৯, ১০ সংখ্যক গীতিতে জলন্ত ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়াছে। আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলে শ্রবণগুরু ও দীক্ষাগুরুর অনুসন্ধান হয়। এই জগতে পতিত অথচ নির্ব্বেদগ্রস্ত জীবের জন্য কৃষ্ণ নিত্যশ্রবণগুরু ও মহান্তগুরু প্রেরণ করিয়া থাকেন। কিরূপ চিত্তবৃত্তিতে গুরুপাদপদ্মের সন্ধান হয়, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শরণাগতির—

"এমন দুর্ম্মতি, সংসার ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ-জন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি॥" ইত্যাদি

অষ্টম গীতিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

একাদশ সংখ্যক গীতিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে জীবন্ত-ভাষায় 'আত্মসমর্পণ' বর্ণন করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। একাদশ গীতি হইতে আত্মনিবেদনের কথা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ গীতির মধ্যে—

"জনক জননী, দয়িত, তনয়।
প্রভু, গুরু, পতি তুঁহু সর্ব্বময়॥"

প্রভৃতি পদ দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মনিবেদনে ভগবান্‌কে মাতা-পিতা-জ্ঞান ভক্তিবিরুদ্ধ নহে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে "পিতা মাতা" সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছু আদায় করিবার চেষ্টা শাক্তেয় মতবাদে দৃষ্ট হয়। ভগবদ্ভক্তের আত্মনিবেদনে ভগবান্‌কে মাতাপিতৃসম্বোধন শাক্তেয় মতবাদের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শরণাগতিতে পরমেশ্বরকে 'ভাই,' 'বন্ধু,' 'মাতা,' 'পিতা,' 'প্রভু,' 'গুরু'—এই সকল কথা বলা হয়; কারণ, তিনিই 'আত্মা' (প্রাণ বা প্রিয়)—"আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ"; অথবা 'মা' ধাতু 'তৃচ্' প্রত্যয় করিয়া 'মাতা' শব্দ নিষ্পন্ন। 'মা' ধাতুর অর্থ—পরিমাণ করা। যিনি আমাদিগের পরিমাণ করেন অর্থাৎ যে বৈকুণ্ঠবস্তু আমাদিগকে পরিমাণ করিতে পারেন,

সেই পূর্ণব্রহ্মই মাতা। আমরা পরিমিত বিভিন্নাংশ জীব। 'পা' ধাতু 'তৃচ্' প্রত্যয় করিয়া 'পিতা' শব্দ নিষ্পন্ন। যিনি আমাদিগকে পালন করেন, রক্ষা করেন, তিনি পিতা। অপবণিগ্-বৃত্তি রহিত হইয়া শরণাগতিতে পরমেশ্বরকে 'মাতা' পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়; কিন্তু কখনও কন্যা, ভগ্নী বা স্ত্রী—এই তিনটী নামের দ্বারা অভিহিত করা যায় না। কারণ, পরমেশ্বর শক্তি-জাতীয় বস্তু নহেন; তিনি শক্তিমান্।

শরণাগতির দ্বাদশ সংখ্যক গীতিতে শরণাগত কিরূপভাবে 'অহং মম' নামাপরাধ পরিত্যাগ করেন, তাহা বর্ণিত আছে—

"আমি শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল।
ত্বদীয়াভিমান আজি হৃদয়ে পশিল॥"

আত্মনিবেদন করিবার পর জীবের আর কোন চিন্তা থাকে না। অনুক্ষণ চিন্তামণির সেবা-চিন্তাই তাহার একমাত্র সহজ-ধর্ম্মরূপে উদিত হয়। তখন তিনি হরিসেবায় সুখ-দুঃখ বিচার করেন না। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য যত দুঃখই উপস্থিত হউক না কেন, তাহা পরম সুখ বলিয়াই শরণাগত ব্যক্তি বরণ করেন। সেবা-সুখে পূর্ব্বে ইতিহাস সমস্ত ভুলিয়া যান, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত তাঁহার আর অন্য অভিলাষ থাকে না এবং কৃষ্ণসেবার জন্য অখিল চেষ্টা করিতে করিতে স্বরূপসিদ্ধি লাভ করেন—

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।

সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ্,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে ॥
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে ॥"

(শরণাগতি—১৬)

এইরূপ শরণাগতির পর ভজন আরম্ভ হয় ; তখন তিনি সদৈন্যে বলেন—

"ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ,
লয়েছে তোমার পায়।
ক্ষমি' অপরাধ, নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায়"

(শরণাগতি—১৭)

শরণাগত জীব কৃষ্ণের বিলাসের আধার কৃষ্ণ-সংসারে এইরূপে অবস্থান করেন—

"তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভোগী।

তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥"
(শরণাগতি—১৬)

শরণাগত ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অননুকরণীয় ভাষায় বলিতেছেন ——

"সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে!
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ-জনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে॥
তব নিজ-জন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে,
প্রতিদিন হ'বে তাহা॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি॥

নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে॥"
(শরণাগতি—১৯)

শরণাগতির পর পরমেশ্বরে কিরূপ গৌরব-বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তাহা ২০, ২১ ও ২২ সংখ্যক গীতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। গৌরবের পর বিশ্রম্ভ-শান্ত "আমি তোমার গরু, তোমার পাল্য"—এইরূপ বিচার হয়। তুমি গো-পালক—

"তুয়া ধন জানি তুহুঁ রাখবি নাথ।
পাল্য গোধন জানি করি তুয়া সাথ॥
চরাওবি মাধব যমুনাতীরে।
বংশী বাজাও ত' ডাকবি ধীরে॥
অঘ, বক মারত রক্ষা বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল কান॥" ইত্যাদি।
(শরণাগতি—২৩)

বিশ্রম্ভ দাস্য, সখ্য ও বৎসলরসে শরণাগত জীব কিরূপে কৃষ্ণসেবা করেন, তাহাও ২৩ সংখ্যক গীতিতে বর্ণিত আছে। ২৪ সংখ্যক গীতিতে শরণাগত জীব পুরুষাভিমান পরিত্যাগ করিয়া মধুর রতিতে গুরুরূপা সখীর আনুগত্যে কিরূপে কৃষ্ণভজন করেন, তাহা চিত্রিত হইয়াছে—

"ছোড়ত পুরুষ-অভিমান।
কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান॥

শরণাগতির ২৫ সংখ্যক গীতিতে নাস্তিক্য, সংশয়, সগুণ, নির্গুণ, ক্লীব-বিচারপরায়ণ, ভক্তি-বহির্ম্মুখ, আধ্যক্ষিক, বঞ্চিত ও বঞ্চকগণের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। শরণাগত ব্যক্তি ইহাদিগকে দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিবেন। ইহারা ভুক্তি-মুক্তির ফাঁদ পাতিয়া লোক-বঞ্চনা করে। ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা শরণাগতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ —

"তব কই নিজ-মতে, ভুক্তি-মুক্তি যাচত,
পাতই নানাবিধ ফাঁদ।
সো সবু বঞ্চক, তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ,
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ॥
বৈমুখ-বঞ্চনে, ভটসো সবু,
নিরমিল বিবিধ পসার।
দণ্ডবৎ দূরতঃ, ভকতিবিনোদ ভেল,
ভকত-চরণ করি সার॥"

শরণাগত ব্যক্তি ভক্তি-প্রতিকূল সর্ব্ববিধ অসৎসঙ্গকে কিরূপ সুদৃঢ় নিষ্ঠার সহিত দূরে পরিত্যাগ করেন, তাহা ভক্তিবিনোদ জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন ——

তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গ-বিরোধি-জন-মুখ না হেরিব॥

ভক্তি-প্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি॥
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব॥
গৌরাঙ্গ-বর্জ্জিত-স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি-বহির্ম্মুখ নিজ-জনে জানি পর॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ॥
যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা এ নিশ্চয় বাণী॥"

(শরণাগতি—২৬)

ভক্তি-প্রতিকূল দুঃসঙ্গের মধ্যে মায়াবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদী সর্ব্বপ্রধান। বিষয়ী ও পাপী হইতেও মায়াবাদী অধিকতর ভক্তি-বিরোধী দুঃসঙ্গ—

"এ দুয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।
মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল॥
ধিক্ তার কৃষ্ণ-সেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥"

(শরণাগতি—২৭)

শরণাগত ব্যক্তি মধুর রতিতে যে সিদ্ধি-লালসা ও প্রতিকূল-সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, তাহা ২৮ সংখ্যক গীতিতে বর্ণিত হইয়াছে—

"আমি ত' স্বানন্দ-সুখদবাসী।
রাধিকা-মাধব-চরণ-দাসী॥
দুঁহার মিলনে আনন্দ করি।
দুঁহার বিয়োগে দুঃখেতে মরি॥
শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলন-সুখ।
প্রতিকুল-জন না হেরি মুখ॥
রাধা-প্রতিকূল যতেক জন।
সম্ভাষণে কভু না হয় মন॥

(শরণাগতি—২৮)

"ছোড়ত পুরুষ অভিমান" (২৪) ও "আমি ত' স্বানন্দ-সুখদ-বাসী"—এই দুইটী গীতিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণ-লীলার স্বারসিকী স্থিতি বর্ণন করিয়াছেন। সিদ্ধির স্বারসিকী স্থিতির প্রতিকূল-বর্জ্জন "আমি ত' স্বানন্দ-সুখদবাসী" গীতিতে লীলাময়ী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ২৯ সংখ্যক গীতিতে শরণাগত কিরূপ ভক্তির অনুকূল-বিষয়-সমূহের সেবা করেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। মাৎসর্য্য ব্যতীত অন্যান্য সকল রিপুকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করিয়া বন্ধু করা যায়; কিন্তু নির্ম্মৎসর ভাগবত-ধর্ম্মে কোনপ্রকার মৎসরতার স্থান নাই—

"ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে॥

শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া॥

তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য-তুলসী-ঘ্রাণ করিব গ্রহণ॥

কর দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতিস্থলে বসিব সর্ব্বদা॥

তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষি-জনে ক্রোধ দেখাইব॥

এইরূপ সর্ব্ববৃত্তি আর সর্ব্বভাব।
তুয়া অনুকূল হ'য়ে লভুক প্রভাব॥"

শরণাগত পুরুষ গৌর-লীলায় কিরূপে স্বারসিকী স্থিতি লাভ করেন, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—

"গোদ্রুম-ধামে ভজন-অনুকরণে।
মাথুর-শ্রীনন্দীশ্বর-সমতুলে॥"

গীতিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"বৈষ্ণব-জন-সহ গাওবুঁ নাম।
জয় গোদ্রুম জয় গৌর কি ধাম॥
ভকতিবিনোদ ভক্তি-অনুকূল।
জয় কুঞ্জ মুঞ্জ সুরনদীকূল॥"

(শরণাগতি—৩০)

শুদ্ধভক্তের চরণরেণু-সেবাই হরিভজনের অনুকূল এবং পরম-সিদ্ধি ও প্রেমলতিকার মূল। সেবা-বৃত্তির উদ্বোধনকারিণী মাধব-তিথি শ্রীএকাদশী যত্নের সহিত পালন, কৃষ্ণধামে অবস্থানকে পরম আদরের সহিত বরণ, গৌর-প্রণয়ী ভক্তের অনুগমনে গৌর-পদাঙ্কিত তীর্থসমূহ ভ্রমণ, গৌরসুন্দর ও গৌরভক্তগণ যে-সকল গান জীবের মঙ্গলের জন্য বিহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা শ্রবণে হৃদয়ের সুখোদ্রেক, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে হৃদয়ে সেবানন্দ-প্রকাশ, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের উচ্ছিষ্ট সেবন করিয়া অনর্থ-জয়, সর্ব্বদা ভজনময় গৃহে গোলোক-প্রতীতিতে অবস্থান, বিষ্ণু-চরণামৃত গঙ্গা ও মাধব-তোষণী তুলসীর সেবা, গৌর-প্রীতির উদ্দীপনা লাভের জন্য গৌরসুন্দরের প্রিয়-বিচারে তন্তুক্কোচ্ছিষ্ট শাক সেবন—প্রত্যহ এইরূপ কৃষ্ণ-ভজনের অনুকূল বস্তু-সমুহের স্বীকার করিয়া কৃষ্ণ-ভজনার্থ জীবনধারণই শরণাগতের একমাত্র স্বাভাবিক চেষ্টা। শরণাগতির ৩২ সংখ্যক গীতিতে কৃষ্ণলীলায় স্বারসিকী স্থিতি কৃষ্ণ-লীলার উদ্দীপন-আলম্বনের সহিত বর্ণিত হইয়াছে—

"যুগল-বিলাসে অনুকূল জানি।
লীলা-বিলাস উদ্দীপক মানি॥

এ সব ছোড়ত কাঁহা নাহি যাঁউ।
এ সব ছোড়তু পরাণ হারাউ॥

ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ॥"

শরণাগতিতে শ্রীরূপানুগ-ভজন-লালসায় ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীরূপের উপদেশামৃতের ভক্তি-প্রতিকূল ছয়টি বেগ, ছয়টি ভক্তির কণ্টক, ভক্তির অনুকূল ছয়টি বৃত্তি, ভক্তিপোষক ছয়প্রকার সঙ্গ, মধ্যম ভক্তের কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবকে যথাক্রমে আদর, প্রণতি ও শুশ্রূষার দ্বারা সেবা, প্রকৃত শুদ্ধ বৈষ্ণবকে প্রাকৃত-বিচারে দর্শন নিষেধ; বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগ ; অত্যাহার, জড়বিষয়ে প্রয়াস, গ্রাম্যকথা, অসৎ নিয়মাগ্রহ, অসৎ জনসঙ্গ, অস্থির সিদ্ধান্তরূপ দোষ দমন ও শোধন করিয়া ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাস, প্রেমলাভে ধৈর্য্য, ভক্তির অনুকূল কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও ভক্তিসদাচাররূপ ছয় গুণ তথা শুদ্ধভক্তের সহিত দান, প্রতিগ্রহ, ভজন-কথা শ্রবণ ও আলাপন, মহাপ্রসাদ সেবন ও মহাপ্রসাদ দানরূপ ছয় সৎসঙ্গ প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন। বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বল জীব কখনও হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে বল প্রাপ্ত হইতে পারে না। কৃষ্ণ—বৈষ্ণবেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। সুতরাং একমাত্র বৈষ্ণবই কৃষ্ণকে দান করিতে পারেন। শরণাগত ও বৈষ্ণব-সেবার কাঙ্গাল হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া বৈষ্ণবের অনুগমন করিলেই শরণাগতিতে সিদ্ধি হয়। সেই কৃষ্ণনামের উচ্চারণ অবিদ্যা-পীড়িত জিহ্বার নিকট প্রথম-মুখে তিক্ত বোধ হয়। তথাপি সিতপল (মিছরি) যেরূপ চোষন করিতে করিতে জিহ্বার পিত্তজনিত তিক্ত স্বাদ বিনাশ করে এবং মধুর রসের আস্বাদন করায়, তদ্রূপ গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে প্রতিদিন আদর করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে থাকিলে নামে রুচি উদ্বুদ্ধ হয়।

দশবিধ অপরাধই জীবের দুর্দ্দৈব। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় সেবোন্মুখ হইয়া নামোচ্চারণ করিতে করিতে সেই দুর্দ্দৈব বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য রুচিপর রসনাকে ও কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য চিন্তাপর মনকে ক্রম-প্রথানুসারে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের নাম-রূপ-গুণ-লীলার সম্যক্ কীর্ত্তনে ও অনুক্ষণ স্মরণাদিতে নিযুক্ত করিয়া ব্রজবাসিজনের অনুগত হইয়া জাতরুচিক্রমে ব্রজবাস-পূর্ব্বক কালযাপনই শ্রীরূপের উপদেশ-সার। সেই শ্রীরূপের আনুগত্যই শরণাগত জীবের একমাত্র কাম্য—

"হা! রূপ গোসাঞি, দয়া করি' কবে,
দিবে দীনে ব্রজবাসা।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ,
হইতে দাসের আশা॥"
(শরণাগতি, রূপানুগ-ভজন-লালসা—৯)

বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা, মথুরা হইতে বৃন্দাবন, বৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধন, গোবর্দ্ধন হইতে রাধাকুণ্ড-তট কৃষ্ণসেবার প্রগাঢ়তা ও চমৎকারিতায় উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোদ্রুম-কাননকে রাধাকুণ্ড-তট-জ্ঞানে তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীরূপের আজ্ঞায় হরিকীর্ত্তন করিতেছেন। সেই রাধাকুণ্ড-তটে একান্তে ভজন করিবার জন্য শ্রীরূপের নিকট দৈন্যের সহিত যোগ্যতা-অধিকার প্রার্থনা করিতেছেন। 'কবে' শব্দের দ্বারা ভক্তি-বিনোদের বিপ্রলম্ভময়ী চিত্তবৃত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরূপানুগ-গণ বিপ্রলম্ভের উপাসক। পুনরায় শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপের নিকট

শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তিত নাম-ভজন-প্রণালী 'তৃণাদপি সুনীচতা', 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা', 'অমানিত্ব,' ও 'মানদত্ব' প্রার্থনা করিতেছেন। কারণ, শরণাগত পুরুষ ঐরূপ ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ-বিভাবিত হইয়াই অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করেন। এ স্থান হইতে শরণাগতির শ্রীরূপানুগ-ভজন-লালসার প্রত্যেকটি গীতিতেই 'কবে' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই 'কবে' আর কিছু নহে, কেবল বিপ্রলম্ভ—

"কিন্তু কবে প্রভো!, যোগ্যতা অর্পিবে,
এ দাসেরে দয়া করি।
চিত্ত স্থির হ'বে, সকল সহিব,
একান্তে ভজিব হরি॥"
(শরণাগতি, রূপানুগ-ভজন-লালসা—১০)

"কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তি-বুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ॥"
(শরণাগতি, রূপানুগ-ভজন-লালসা—১১)

"গুরুদেব! কবে মোর সেই দিন হ'বে।
মন স্থির করি, নির্জ্জনে বসিয়া,
কৃষ্ণনাম গাব কবে॥"
(শরণাগতি রূপানুগ-ভজন-লালসা—১২)

"গুরুদেব ! কবে তব করুণা প্রকাশে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা, হয় নিত্য তত্ত্ব,
এই দৃঢ় বিশ্বাসে।
'হরি' 'হরি' বলি, গোদ্রুম-কাননে,
ভ্রমিব দর্শন-আশে ॥"
(শরণাগতি, রূপানুগ-ভজন-লালসা—১৩)

"কবে গৌর-বনে, সুরধুনী-তটে,
হা রাধে ! হা কৃষ্ণ ! ব'লে।
কাঁদিয়া বেড়া'ব, দেহ-সুখ ছাড়ি',
নানা লতা-তরুতলে ॥
দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে,
নিজ-স্থূল পরিচয়।
নয়নে হেরিব, ব্রজপুর-শোভা,
নিত্য চিদানন্দময় ॥"
(শরণাগতি, রূপানুগ-সিদ্ধি-লালসা—১৫)

শরণাগতির 'বিজ্ঞপ্তি'তে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের 'শিক্ষাষ্টক' অবলম্বনে শুদ্ধ নামে রুচি প্রার্থনা করিতে করিতে বিপ্রলম্ভে উদ্ভাসিত হইয়াছেন—

"কবে হ'বে বল সেদিন আমার।
অপরাধ ঘুচি, শুদ্ধ নামে রুচি,
কৃপা-বলে হ'বে হৃদয়ে সঞ্চার ॥
তৃণাধিক হীন, কবে নিজে মানি,
সহিষ্ণুতা গুণ হৃদয়েতে আনি।

সকলে মানদ, আপনি অমানী,
হ'য়ে আস্বাদিব নাম-রস-সার ॥"

আবার গাহিয়াছেন—

"কবে নবদ্বীপে, সুরধুনী-তটে
গৌর-নিত্যানন্দ বলি' নিষ্কপটে ।
নাচিয়া গাইয়া, বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার ॥
কবে নিত্যানন্দ, মোরে করি' দয়া,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া ।
দিয়া মোরে নিজ- চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার ॥"

হরিনামরসের রসিক একাকী সেই রস আস্বাদন করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। পরদুঃখদুঃখী নামকীর্ত্তনাচার্য্য সকলকে সেই রস আস্বাদন করাইবার জন্য পাগলপারা হইয়া থাকেন। ইহারই নাম 'জীবে দয়া'—

"কবে জীবে দয়া, হইবে উদয়,
নিজ-সুখ ভুলি' সুদীন হৃদয় ।
ভকতিবিনোদ, করিয়া বিনয়,
শ্রীআজ্ঞা-টহল করিবে প্রচার ॥"
(শরণাগতি, রূপানুগ-ভজন-লালসা—বিজ্ঞপ্তি)

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ ॥

ভারতভূমেতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার ॥"

—ইহাই হইল 'শ্রীআজ্ঞা' অর্থাৎ মহাপ্রভুর আদেশ। সেই আদেশের টহল প্রচারের নামই—"জীবে দয়া"; তাহা এই—

"প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥
অপরাধ-শূন্য হইয়া লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন, প্রাণ ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্ম-সার ॥"

সর্ব্বশেষে শ্রীমদ্ভাগবতের "তদশ্মসারং" শ্লোক অবলম্বনে মধুর রতিতে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামের তত্ত্ব, রস ও সেবা-প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন—

"কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি-মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম ॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ ॥

চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম ,
বিবর্ণ হইল কলেবর ।
মূর্চ্ছিত হইল মন , প্রলয়ের আগমন ,
ভাবে সর্ব্ব দেহ জর জর ॥
করি' এত উপদ্রব , চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব ,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে ।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত, বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে ॥
লইনু আশ্রয় যার, হেন ব্যবহার তার ,
বর্ণিতে না পারি এ সকল ।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয় ,
সেই মোর সুখের সম্বল ॥
প্রেমের কলিকা নাম , অদ্ভুত রসের ধাম ,
হেন বল করয়ে প্রকাশ ।
ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজ-রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণ-পাশ ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস ।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ ॥

কল্যাণকল্পতরু

প্রেমামরতরু শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠধাম হইতে ভূতলে "কল্যাণ-কল্পতরু" আনয়ন করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের নিঃশ্রেয়স-বনে সেই কল্যাণকল্পতরু বিরাজিত। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই কল্যাণ-কাননের কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ।
সর্ব্বর্ত্তু শ্রীভির্বিভ্রাজৎ কৈবল্যমিব মূর্ত্তিমৎ॥

(ভাঃ ৩।১৫।১৬)

সেই ধামে মূর্ত্তিমান্ শুদ্ধভক্তিসুখস্বরূপ 'নিঃশ্রেয়স' নামে একটী বন বিরাজিত; সেই বনটী সকল ঋতুর পুষ্পাদি সম্পদ্‌যুক্ত ফলবৃক্ষ-সমূহদ্বারা পরিশোভিত।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'কল্যাণকল্পতরু'র মঙ্গলাচরণে গাহিয়াছেন,—

"শ্রীবৈকুণ্ঠধামে আছে নিঃশ্রেয়স বন।
তাহে শোভা পায় কল্পতরু অগণন॥
তহি-মাঝে এ কল্যাণকল্পতরুরাজ।
নিত্যকাল নিত্যধামে করেন বিরাজ॥
স্কন্ধত্রয় আছে তা'র অপূর্ব্ব দর্শন।
উপদেশ, উপলব্ধি, উচ্ছ্বাস গণন॥

সুভক্তিপ্রসূন তাহে অতি শোভা পায়।
'কল্যাণ' নামক ফল অগণন তায়॥
যে সুজন এ বিটপী করেন আশ্রয়।
'কৃষ্ণসেবা'-সুকল্যাণ-ফল তাঁ'র হয়॥
শ্রীগুরুচরণ-কৃপা-সামর্থ্য লভিয়া।
এ-হেন অপূর্ব্ব বৃক্ষ দিলাম আনিয়া॥"

কল্যাণকল্পতরুর তিনটি স্কন্ধ—(১) উপদেশ, (২) উপলব্ধি ও (৩) উচ্ছ্বাস। এই তিন স্কন্ধে বহু শুদ্ধভক্তিকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। এই কল্পবৃক্ষ কল্যাণফল দান করেন। সেই কল্যাণ-ফলই—অপ্রাকৃত-যুগল-সেবা। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সকলকে বলিতেছেন—

"তোমরা সকলে হও এ বৃক্ষের মালী।
শ্রদ্ধা-বারি দিয়া পুনঃ কর রূপশালী॥
ফলিবে কল্যাণ-ফল—যুগল-সেবন।
করিব সকলে মিলি' তাহা আস্বাদন॥"

(কল্যাণকল্পতরু—মঙ্গলাচরণ)

স্বরূপশক্তি-সমাশ্লিষ্ট স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের বিলাসের সেবানুগমনই জীবের চরম কল্যাণ—

কল্যাণকল্পতরুর মঙ্গলাচরণে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন—

"নিখিল বৈষ্ণব-জন দয়া প্রকাশিয়া।
শ্রীজাহ্নবা-পদে মোরে রাখহ টানিয়া॥"

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীস্বরূপিণী জাহ্নবা দেবীর আশ্রয় প্রার্থনা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচারে দেখিতে পাওয়া যায়। কল্যাণকল্পতরুতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণবের অধিকার বিচার করিয়া বৈষ্ণব-সেবার কথা বলিয়াছেন। বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব চিনিতে না পারার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর নাই—

"আমি ত' দুর্ভাগা অতি, বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥
শ্রীগুরু-চরণে মোরে ভক্তি কর দান।
যে চরণ-বলে পাই তত্ত্বের সন্ধান॥"

এইরূপ নিষ্কপট আর্ত্তি, দৈন্য, কার্পণ্য, আত্মনিবেদন ও একান্ত শরণাগতি থাকিলে বৈষ্ণব-ঠাকুর কৃপা করিয়া বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব চিনাইয়া দেন। তখন বৈষ্ণব-ঠাকুরের কৃপায় গুরুপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি, বৈষ্ণবের অধিকার-উপলব্ধি ও ভগবৎপাদপদ্মের সন্ধান লাভ হয়।

কল্যাণকল্পতরুর স্কন্ধত্রয়ের সর্ব্বপ্রথম স্কন্ধ 'উপদেশে'র প্রারম্ভে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"দীক্ষাগুরু কৃপা করি' মন্ত্র-উপদেশ।
করিয়া দেখান কৃষ্ণতত্ত্বের নির্দ্দেশ॥

শিক্ষাগুরুবৃন্দ কৃপা করিয়া অপার।
সাধকে শিখান সাধনের অঙ্গসার॥"

দীক্ষাগুরু কৃপাপূর্ব্বক মন্ত্র-উপদেশ করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বের নির্দ্দেশ করেন। এইজন্যই শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদে দেখিতে পাওয়া যায়—

"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।"

দীক্ষাগুরু—এক, কিন্তু শিক্ষাগুরু বহু হইতে পারেন। তাঁহারা কৃপা করিয়া সাধককে ভজন শিক্ষা দেন।

'উপদেশে'র মধ্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মনকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ-বিমুখ জীবের নিত্যমঙ্গলের উপদেশ দিয়াছেন। এই জগতের বহির্ম্মুখ জীবের যে-সকল অনর্থ—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রতাদি অভক্তি-চেষ্টা জীবকে কল্যাণকল্পতরুর ফলের আস্বাদনে চিরবিমুখ করিয়া রাখিয়াছে,ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অপার কৃপা করিয়া নানাপ্রকার যুক্তি ও সদুপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি হইতে নির্ম্মুক্ত না হইলে শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না। কল্যাণকল্পতরুর প্রথম গানে তিনি ভূতশুদ্ধি-শিক্ষা-দান, জীব-স্বরূপ ও জীব-সংসার বর্ণন করিয়াছেন; দ্বিতীয় গানে জড়কাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা উপদেশ করিয়াছেন; তৃতীয় গানে সংশয়-বাদ নিরসন করিবার জন্য বৈষ্ণবের কৃপার বল প্রার্থনা করিবার উপদেশ দিতেছেন,—

"বৈষ্ণবের কৃপাবলে, সন্দেহ যাইবে চলে',
তুমি পুনঃ হইবে তোমার।
পা'বে বৃন্দাবন-ধাম, সেবিবে শ্রীরাধা-শ্যাম,
পুলকাশ্রুময় কলেবর॥"

চতুর্থ সঙ্গীতে পাষণ্ডিত্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবার কথা উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান্ অচ্যুতের সেবাতেই সকলের সেবা হয়—

"মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর।
হরিভক্তি আছে যাঁ'র, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁ'র,
ভক্তে সবে করেন আদর॥"

পঞ্চম সঙ্গীতে সংশয়-মূলক তর্কপথাশ্রিত নির্ব্বিশেষ-মত নিরাস, ষষ্ঠ সঙ্গীতে জড়বিদ্যার অনুশীলন নিরাস, সপ্তম ও দশম সঙ্গীতে জড়বিদ্যার ভোগমূলক অনুশীলন নিরাস করিয়াছেন—

"মন রে কেন কর বিদ্যার গৌরব।
স্মৃতিশাস্ত্র ব্যাকরণ, নানা-ভাষা-আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ॥
কিন্তু দেখ চিন্তা করি,' যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
কৃষ্ণ-প্রতি অনুরক্তি, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হ'তে তাহা অসম্ভব॥
বিদ্যায় মার্জ্জন তা'র, কভু কভু অপকার,
জগতেতে করি অনুভব।
যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণরতি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর জান সব॥

ভক্তি বাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব॥"
(কল্যাণকল্পতরু, উপদেশ—১০)

অষ্টম সঙ্গীতে নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান নিরাস করিয়াছেন—
"বিন্দু নাহি হয় সিন্ধু, বামন না স্পর্শে ইন্দু,
রেণু কি ভূধর-রূপ পায় ?"

উপদেশের নবম সঙ্গীতে জড়বর্ণাভিমান নিরাস করিয়াছেন। উচ্চবর্ণই হউক, আর নীচবর্ণই হউক, যে-কোন প্রকার বর্ণের অভিমান দেহাত্মবোধ হইতেই জাত। দেহাত্মবোধ থাকিলে কোন দিন কৃষ্ণপাদপদ্ম-রেণুতে আত্মবোধ হয় না—

"মন রে, কেন আর বর্ণ-অভিমান।
মরিলে পাতকী হ'য়ে, যমদূতে যাবে ল'য়ে,
না করিবে জাতির সম্মান॥
যদি ভাল কর্ম্ম কর, স্বর্গভোগ অতঃপর,
তা'তে বিপ্র-চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুই জনে, দণ্ড পা'বে একসনে,
জন্মান্তরে সমান বিধান॥
সামাজিক মান ল'য়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে,
বৈষ্ণবে না কর অপমান।

আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান্ ॥"

একাদশ সঙ্গীতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জড়-রূপ-মদ, দ্বাদশ সঙ্গীতে ধন-মদ, ত্রয়োদশ সঙ্গীতে জড়ত্যাগপর ফল্গু-সন্ন্যাস নিরাস করিয়াছেন। সন্ন্যাস-লিঙ্গের দ্বারা হরিভক্তি মাপা যায় না। যিনি সন্ন্যাস-বিধি স্বীকার করিয়াছেন, তিনিই খুব বড় ভক্ত—এরূপ নহে। অহৈতুকী ভক্তি-বৃত্তির দ্বারাই ভক্ত পরিলক্ষিত হন। আধুনিক একশ্রেণীর ব্যক্তি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়া বলিতেছেন যে, সাজা সন্ন্যাসী না হইলে আচার্য্য হওয়া যায় না। ইহা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী বদ্ধজীবের অভক্তিপর মতবাদ। তাহাদেরই জন্য ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরুতে গাহিয়াছেন—

"মন! তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেন চাও।
বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত,
দম্ভ পূজি' শরীর নাচাও ॥
সন্ন্যাস-বৈরাগ্য-বিধি, সেই আশ্রমের নিধি,
তাহে কভু না কর আদর।
সে-সব আদরে ভাই, সংসারে নিস্তার নাই,
দাম্ভিকের লিঙ্গ নিরন্তর ॥
তুমি ত' চৈতন্যদাস, হরিভক্তি তব আশ,
আশ্রমের লিঙ্গে কিবা ফল।

প্রতিষ্ঠা করহ দূর, বাস তব শান্তিপুর,
সাধু-কৃপা তোমার সম্বল ॥
বৈষ্ণবের পরিচয়, আবশ্যক নাহি হয়,
আড়ম্বরে কভু নাহি যাও।
বিনোদের নিবেদন, রাধাকৃষ্ণ-গুণগণ,
ফুকারি' ফুকারি' সদা গাও ॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ফল্গু-সন্ন্যাস নিরাস করিয়াছেন বলিয়া কাহাকেও গৃহব্রত বা গৃহাসক্ত হইতে বলেন নাই। একদিকে যেমন গৃহাসক্তি নিষেধ করিয়াছেন, অপরদিকে আশ্রমাদির বাহ্য পোষাকের প্রতি অত্যাসক্তি বা দাম্ভিকতাও বর্জ্জন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। "সন্ন্যাসী সাজিয়াছি" মনে করিয়া কেহ যে-কোন বেশে অবস্থিত নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবকে 'ছোট' বিচার করিলে তাহাকে জন্ম-জন্মান্তর ভগবদ্‌বিমুখতার দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম সর্ব্বদাই আনুগত্যময়। যেখানে স্বতন্ত্রতা, সেখানেই ভোগোন্মুখতা। বুভুক্ষা-মূলে জীবের তীর্থ-ভ্রমণের প্রয়াস—একটি অন্যাভিলাষ। ঐরূপ অন্যাভিলাষ থাকিলে কল্যাণ-ফল-লাভ সুদূরপরাহত। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চতুর্দ্দশ সঙ্গীতে ঐরূপ তীর্থাটন-কাম নিরাস ও প্রকৃত তীর্থের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। অযোধ্যা, মথুরাদি সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরী কর্ম্মকাণ্ডীয় বুভুক্ষা বা জ্ঞানকাণ্ডীয় মুমুক্ষা-বৃত্তির সহিত ভ্রমণ কেবল "নিরর্থক পরিশ্রম," তাহা "চিত্ত স্থির নাহি করে"—

তীর্থফল—সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মনোহর।
যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ-চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উপদেশ করিতেছেন যে, যে-তীর্থে বৈষ্ণব অবস্থান করেন না, যেখানে বৈষ্ণবের বাণী শুনা যায় না, বৈষ্ণবের সেবা লাভ হয় না, সেই তীর্থে গমন কেবল বৃথা পর্য্যটন-ক্লান্তি-মাত্র। যেখানে বৈষ্ণবগণ বাস করেন, সেই স্থানই বৃন্দাবন। সেই স্থানে নিত্যানন্দ বিরাজিত। তথায় কৃষ্ণভক্তি-গঙ্গা প্রবাহিতা, মুক্তি তথায় দাসীর মত ভক্তির সেবা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তথাকার পর্ব্বতসমূহ—গোবর্দ্ধন, ভূমি—চিন্তামণি বৃন্দাবন, হ্লাদিনী তথায় স্বপ্রকাশিতা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সার উপদেশ এই—

"বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত।"

পঞ্চদশ গীতিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-মূলক ব্রতাচার ও তপস্যার অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন; এই বিষয়ে ভক্তিবিনোদ উপদেশ প্রদান করিতেছেন যে, ব্রতে আচ্ছন্ন হইলে কখনও আত্মার সহজ-বৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয় না—

"ভক্তি যে সহজ তত্ত্ব, চিত্তে তা'র আছে সত্ত্ব,
তাহার সমৃদ্ধি তব আশ।

দেখিবে বিচার করি' সু-কঠিন ব্রত ধরি'
সহজের না কর বিনাশ ॥
কৃষ্ণ-অর্থে কায়ক্লেশ, তা'র ফল আছে শেষ,
কিন্তু তাহা সামান্য না হয়।
ভক্তির বাধক হ'লে, ভক্তি আর নাহি ফলে,
তপঃফল হইবে নিশ্চয় ॥
কিন্তু ভে'বে, দেখ ভাই, তপস্যায় কাজ নাই,
যদি হরি আরাধিত হন।
ভক্তি যদি না ফলিল, তপস্যার তুচ্ছ ফল,
বৈষ্ণব না লয় কদাচন ॥"

—ইহা আত্মমঙ্গলকামীর জন্য উপদেশ; কিন্তু যাহারা আত্ম-মঙ্গলের অধিকার গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ, তাহারা পাপাসক্তি হইতে সাময়িকভাবে কথঞ্চিৎ মুক্ত থাকিবার জন্য তপস্যা-ব্রতাদি-কর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত হন।

ষোড়শ সঙ্গীতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অভক্ত-ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ধূর্ত্ত লোকের সঙ্গ সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যাজ্য। কপটের সঙ্গ করিলে কখনও আত্ম-মঙ্গল লাভ হয় না—

"বুজ্‌রুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই,
তা'র সঙ্গ তোমারে নাচায়।
'ক্রূর-বেশ দেখ যা'র, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার,
ভক্তি করি' পড় তা'র পায় ॥"

কপট লোক কপট ব্যক্তিকেই 'সাধু' বলিয়া মনে করে। আবার কতকগুলি অজ্ঞ লোক ভাগ্যদোষে বুজ্‌রুগের পাল্লায় পড়িয়া যায়।

সপ্তদশ সঙ্গীতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রৌতপথ বা আম্নায়-বিধি ও শাস্ত্রানুগত্যহীন স্বতন্ত্রতামূলক ভজনাভিনয় নিরাস করিয়াছেন। কতিপয় ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার বা যথেচ্ছাচারিতারূপ মায়াবীর মোহে মুগ্ধ হইয়া অসাম্প্রদায়িক হইবার যুক্তিতে শ্রৌতপথ, মহাজনানুগত্য ও শাস্ত্রানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া মনোধর্ম্মের কৈঙ্কর্য্য করিবার দুর্ব্বুদ্ধিতে পতিত হয়, তাহারাই সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি করিয়া সৎ-সাম্প্রদায়িক দীক্ষা বা তিলক-মালাদি-সদাচার-গ্রহণের বিরুদ্ধবাদী হইয়া মনঃকল্পিত নবীন মত প্রচার করে। তাহাদের যুক্তি এই যে, ভণ্ড বা ধূর্ত্তেরা তিলক-ফোঁটা, দীক্ষা, মালা প্রভৃতি ধারণ করিয়া অন্যায় কার্য্য করে; অতএব ঐসকল চিহ্নই তজ্জন্য দায়ী। বস্তুতঃ যাহারা লোকভয় বশতঃই হউক বা ভক্তিদেবীর প্রতি বিমুখতা-বশতঃই হউক, বহির্ম্মুখ-লোকপ্রিয়তা এবং চিৎ ও অচিৎএর গোঁজামিল দেওয়াকেই বহুমানন করে, তাহারাই সৎ-সম্প্রদায়ে দোষারোপ করিয়া মনঃকল্পিত সম্প্রদায় রচনা করে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অতি সজীব-ভাষায় ইহা বর্ণন করিয়াছেন—

"সম্প্রদায়ে দোষ-বুদ্ধি, জানি' তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলক-মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান॥

পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজ-মত প্রচারিয়া,
নিজে অবতার-বুদ্ধি ধরি'।
ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রম-দৃষ্টি করি'॥
ফোঁটা দীক্ষা মালা ধরি', ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে' তোমার বিরাগ।
মহাজন-পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ প্রতি ছাড়' অনুরাগ॥
এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' লৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হ'বে উপায়॥"

কল্পতরুর অষ্টাদশ উপদেশ-গীতিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত্রিম অভ্যাস, পিচ্ছিল-স্বভাব-জনিত ছায়া ও প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসকে নিরাস করিয়াছেন। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে যে নানাপ্রকার কৃত্রিম ও আনুকরণিক ভাব-বিকার দেখিতে পাওয়া যায়, উহা সম্পূর্ণ কপটতা ও ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জলন্ত-ভাষায় ইহা এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে—

"কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল "প্রেম প্রেম," বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥

অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ-ঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎ সঙ্গ,
কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া॥
প্রেমের সাধন—'ভক্তি,' তা'তে নৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ-অপরাধ ত্যজি', নিরন্তর নাম ভজি'
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি',
দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন॥
অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্য পাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥"

প্রতিবিম্ব ছায়া-নামাভাস-সম্বন্ধে শ্রীরূপানুগবর ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিচারানুসারে 'শ্রীহরিনামচিন্তামণি'র পাদ-টীকায় অনেক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রতিবিম্ব ছায়া-নামাভাস একটি দুরূহ অপরাধ। ঐ গীতিতে ঠাকুর সর্ব্বশেষে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

উনবিংশ গীতিতে আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-জনিত প্রকৃত সাধুসঙ্গে বিতৃষ্ণা এবং ক্রম-বিধানানুসারে শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে ভজন-ক্রিয়া, ভজন-ফলে অনর্থ-নিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তির উদয়, আসক্তি হইতে ভাব ও ভাবের পরিপক্কতায় প্রেম-লাভের ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা এই ক্রম-সাধন পরিত্যাগ করিয়া নাটকাভিনয়ের মত কপট-ভাব প্রদর্শন করে, তাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস—কামুক। অতএব ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কল্যাণকল্পতরুর সর্ব্বশেষ 'উপদেশ'—

"নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার,
ছাড়' ভাই অপরাধ-দোষ ॥"

কল্যাণকল্পতরুর দ্বিতীয় স্কন্ধের নাম—উপলব্ধি। সেই উপলব্ধি বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত—(১) অনুতাপ-লক্ষণউপলব্ধি, (২) নির্ব্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি, (৩) সম্বন্ধ-বিজ্ঞান-উপলব্ধি, (৪) অভিধেয়-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি, (৫) প্রয়োজনবিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি। অনুতাপ-লক্ষণ-উপলব্ধিতে পাঁচটি সঙ্গীত, নির্ব্বেদ-লক্ষণে পাঁচটি সঙ্গীত এবং সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণে একত্রে চারিটি সঙ্গীত দৃষ্ট হয়।

'উপলব্ধি'র প্রথম সঙ্গীতে দুর্লভ-মনুষ্য-জন্মে হরিভজন না হইলে কিরূপ প্রকৃতির দাসত্বে জীবন অতিবাহিত হয়, তাহার চিত্র

প্রকাশিত হইয়াছে। তথাপি কল্যাণের আভাস উদিত হইলে অনুতাপ-লক্ষণ-উপলব্ধি চিত্তে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিছুকাল গর্ভাবাসে, কিছুকাল খেলা-ধূলায়, কিছুকাল গ্রাম্য-ধর্ম্মে, কিছুকাল রোগ-শোকে কাটাইয়া জীবনের ব্যর্থতা-সাধন-জন্য 'উপলব্ধি' ও 'নির্ব্বেদ' উপস্থিত হইলে সুবুদ্ধিযুক্ত হইয়া মনুষ্য কল্যাণের অনুসন্ধান করে। "ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া"; "বিদ্যার বিলাসে কাটাইনু কাল"; "যৌবনে যখন ধন-উপার্জ্জনে" (শরণাগতি—২, ৩, ৪)—শরণাগতির এই সঙ্গীতসমূহ কল্যাণ-কল্পতরুর 'উপলব্ধি'র প্রথম সঙ্গীতের সহিত সমতাৎপর্য্যবিশিষ্ট।

'উপলব্ধি'র দ্বিতীয় সঙ্গীতে সাধুজনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গের প্রভাবে লোকের চিত্তবৃত্তির অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তথাকথিত সভ্যতা কেবল অন্যাভিলাষযুক্ত বহির্ম্মখ সঙ্গের ফলমাত্র—

"সুবর্ণ করিয়া ত্যাগ, তুচ্ছ লোষ্ট্র-অনুরাগ,
দুর্ভাগার এই ত' লক্ষণ।
কৃষ্ণেতর সঙ্গ করি, সাধুজনে পরিহরি',
মদ-গর্ব্বে কাটা'নু জীবন॥
ভক্তিমুদ্রা দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
বাতুলতা বলিয়া তাহায়।
যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি,' হারাইনু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায়॥"

'উপলব্ধি'র তৃতীয় সঙ্গীতে সংকর্ম্ম-পিপাসা-মত্ত জীব স্বর্গসুখাদি-লাভের আশায় উপবাস-ব্রত, নানা কায়ঃক্লেশ, নানা কৃচ্ছ্র সাধ্য তপস্যা ও বর্ণাশ্রমে নানা দেবদেবীর পূজা, শাস্ত্র-অধ্যয়ন-শ্রম স্বীকার করিয়া পরিণামে যাহা লাভ করেন, তাহাতে আত্মমঙ্গলের কিছুই সঞ্চিত হয় না। তদ্দ্বারা উর্ণনাভের ন্যায় কর্ম্মজালে বিজড়িত ও ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হয় মাত্র।

'উপলব্ধির চতুর্থ সঙ্গীতে নির্ব্বিশেষজ্ঞান-মতের সর্ব্বাপেক্ষা অপকারিতার উপলব্ধি—

"আমি ব্রহ্ম একমাত্র, এ জ্বালায় দহে গাত্র,
ইহার উপায় কিবা ভাই।
বিকার যে ছিল ভাল, ঔষধ জঞ্জাল হ'ল,
ঔষধ-ঔষধ কোথা পাই॥"

জীব ত্রিতাপ-জ্বালায় তপ্ত হইয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনকে ঔষধরূপে স্থির করেন। কিন্তু সেই ঔষধই তাহার পক্ষে বিষের ক্রিয়া করে। রোগ ও রোগী উভয়ের বিনাশক ঔষধ ঔষধ-পদ-বাচ্য নহে। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মোপলব্ধিতে জীবের আত্মবিনাশ ঘটে।

'উপলব্ধি'র পঞ্চম সঙ্গীতে কৃত্রিমভাবে, ক্লেশ-নিবৃত্তি-চেষ্টার অকিঞ্চিৎকরতার উপলব্ধি বর্ণিত হইয়াছে।

নির্ব্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধির দ্বিতীয় সঙ্গীতে বিষয়-বাসনা, জড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহার অকিঞ্চিৎকরত্ব, জড়দেহ ও তজ্জনিত

ভোগের ক্ষণিকত্ব ও ভগবদ্ভক্তির নিত্যত্বের উপলব্ধি প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবন্ত ভাষায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা elevationismকে নিরাস করিয়া বলিতেছেন—

"ওরে মন, বাড়িবার আশা কেন কর।
পার্থিব উন্নতি যত, শেষে অবনতি তত,
শান্ত হও মোর বাক্য ধর ॥
আশার ইয়ত্তা নাই, আশাপথ সদা ভাই,
নৈরাশ্য-কণ্টকে রুদ্ধ আছে।
বাড়ে যত আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে ॥
এক রাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য কা'ল চাও,
সর্ব্বরাজ্য কর যদি লাভ।
তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ,
ছাড়ি' চা'বে ব্রহ্মার প্রভাব ॥
ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই, শিবপদ কিসে পাই,
এই চিন্তা হ'বে অবিরত।
শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্মসাম্য তদন্তর,
আশা করে শঙ্করানুগত !
অতএব আশা-পাশ, যাহে হয় সর্ব্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন-ভাব ল'য়ে, চৈতন্য-চরণাশ্রয়ে,
বাস কর সদা শান্তিপুরে ॥"

নির্ব্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধির তৃতীয় সঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে—ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা—দুইটিই পিশাচী। তন্মধ্যে মুক্তিবাঞ্ছা আরও অধিক দুষ্ট—

"মুক্তিবাঞ্ছা দুষ্ট অতি, নষ্ট করে শিষ্টমতি,
মুক্তি-স্পৃহা কৈতব-প্রধান।
তাহা যে ছাড়িতে নারে, মায়া নাহি ছাড়ে তা'রে,
তা'র যত্ন নহে ফলবান্॥
অতএব স্পৃহাদ্বয়, ছাড়ি' শোধ' এ হৃদয়,
নাহি রাখ কামের বাসনা।
ভোগ-মোক্ষ নাহি চাই, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পাই,
বিনোদের এই ত' সাধনা॥"

শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"র প্রারম্ভে—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্॥
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

—শ্লোকে 'অন্যাভিলাষিতাশূন্য' অর্থে—"অহৈতুকী" ও 'জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃত' অর্থে—"অপ্রতিহতা" অধোক্ষজ-ভক্তির কথা বলিয়াছেন। শ্রীরূপের "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতের "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্ম" শ্লোকেরই বিবৃতি। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর কথিত সেই "উত্তমা ভক্তি"ই জগতে আচারমুখে প্রচার করিয়াছেন। ভোগ-মোক্ষ-বাসনা থাকিলে ভক্তিকে 'অহৈতুকী' ও 'অপ্রতিহতা' বলা যায় না। ঐ দুইটি চেষ্টা সম্পূর্ণ অভক্তিবাদ বা ভক্তি-বিরোধ।

নির্ব্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধির চতুর্থ সঙ্গীতে দেহ, গেহ, পুত্র-কলত্রাদির অনিত্যতা ও বহির্ম্মুখ-সংসারের জন্য প্রয়াস অতি প্রাণ-স্পর্শিনী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য এই সঙ্গীতটি নির্ব্বেদ-উপলব্ধির বিশেষ উদ্দীপক—

"দুর্লভ মানবজন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু,—দুঃখ কহিব কাহারে॥
'সংসার' 'সংসার' ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই, ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥"

দেহারামতা হরিভজনের বিশেষ প্রতিকূল। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকাদির জড়স্পৃহা জীবকে চেতনের অনুশীলন করিতে বাধা দেয়। ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে জীব সাধু-গুরু-কৃপায় চেতনের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন—

"আর কেন জীব জড়ে করিবে সমর!
জড়ে দেও বিসর্জ্জন, শুদ্ধজীব-প্রবোধন,
সহজ-সমাধি-যোগে সাধ'।
ক্রমে ক্রমে জড়সত্তা হ'বে অবসর।
সিদ্ধদেহ-অনুগত, কর' দেহ জড়াশ্রিত,
পরমার্থ না হইবে বাধ॥"

(কল্যাণকল্পতরু, নির্ব্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি—৫)

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন—এই ত্রিতত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান। কল্যাণ-কল্পতরুতে এই ত্রিতত্ত্বের উপলব্ধি-বিজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। নিষ্কিঞ্চন-সাধুগণ যোগৈশ্বর্য্য, ভোগৈশ্বর্য্য ও যাবতীয় ঔপাধিক-ধর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া রাগ-দ্বেষ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্যের সহিত সর্ব্বদা কৃষ্ণভজনে প্রমত্ত থাকেন। সাধুগণের কোন প্রকার লিঙ্গ-নিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা সর্ব্বনিরপেক্ষ—

"অতএব লিঙ্গহীন সদা সাধুজন।
দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন॥
জ্ঞানের প্রয়াসে কাল না করি' যাপন।
ভক্তি বলে নিত্যজ্ঞান করেন সাধন॥
যথা তথা বাস করি', যে-সে বস্ত্র পরি'।
সুলব্ধ-ভোজনদ্বারা দেহরক্ষা করি'॥
কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণসেবা-আনন্দে মাতিয়া।
সদা কৃষ্ণপ্রেমরসে ফিরেন গাহিয়া॥"

(কল্যাণকল্পতরু, সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-উপলব্ধি—১)

প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধিটি ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ অমিত্রাক্ষর-ছন্দে বর্ণন করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১২৭০ বঙ্গাব্দে (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ) "বিজন-গ্রাম" নামক বাঙ্গালা কাব্যে অমিত্রাক্ষর-ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কল্যাণকল্পতরুর প্রয়োজন-বিজ্ঞান-উপলব্ধিতে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে (১৮৮১ খৃষ্টাব্দ) অমিত্রাক্ষর-ছন্দে সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বকে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। জড়জগৎ চিজ্জগতের প্রতিবিম্ব; যথা—

"বৈকুণ্ঠ-নিলয়ে যেই অপ্রাকৃত রতি
সুমধুর মহাভাবাবধি।
তা'র তুচ্ছ অনুকৃতি পুরুষ-প্রকৃতি
সঙ্গসুখ-সংক্লেশ-জলধি ॥
অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ করিয়া আশ্রয়
সহজ-সমাধি-যোগবলে।
সাধক প্রকৃতিভাবে শ্রীনন্দ-তনয়
ভজেন সর্ব্বদা কৌতূহলে ॥"

(কল্যাণকল্পতরু, প্রয়োজন-বিজ্ঞান-উপলব্ধি—৩)

সমস্ত জীবনটি বহির্ম্মুখ-গৃহ-সেবায় কাটাইয়া দিয়া—জীবন-যৌবন, বল-বীর্য্য সমস্তই সংসারের সেবায় নিঃশেষিত করিয়া অসমর্থ অবস্থায় "পেন্সন্" ভোগ করিবার জন্য বার্দ্ধক্যে কৃষ্ণ-ভজনের কৃত্রিম ইচ্ছা যে কিরূপ আত্ম-বঞ্চনা, তাহা ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের সজীব ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে,—

সংসার নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন ॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন ॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ ॥"

(কল্যাণকল্পতরু, প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি—৪)

কল্যাণকল্পতরুর তৃতীয় স্কন্ধের নাম—উচ্ছ্বাস। তাহাতে দৈন্যময়ী ও লালসাময়ী প্রার্থনা ও বিজ্ঞপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রার্থনা-সমূহ ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনার অনুরূপ সহজ, সরল, অকৃত্রিম আর্ত্তির অভিব্যক্তি। এই সকল "প্রার্থনা" পাঠ, আবৃত্তি বা কীর্ত্তন করিতে করিতে জন্ম-জন্মান্তরের রুদ্ধ-সেবা-মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। এই প্রার্থনা-সমূহ শতমুখী মার্জ্জনীর ন্যায় হৃদয়-গুণ্ডিচা মার্জ্জন করিয়া তাহাকে সত্ত্বোজ্জ্বল ভক্তিপীঠরূপে প্রকাশিত করিতে পারে। ইহাতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবকে 'গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলি' হইয়া, দন্তে তৃণ-ধারণ-পূর্ব্বক বৈষ্ণবের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া আত্ম-নিবেদন করিবার শিক্ষা দিয়াছেন। বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী—এই অমোঘ আশ্বাসটী প্রদান করিয়াছেন। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পতিতপাবনত্বের নিকট নিজের অযোগ্যতাকে অকপট ভাবে ডালি দিবার জন্য জীবকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। নিত্যা-নন্দশক্তি, কৃষ্ণভক্তি-গুরু জাহ্নবাদেবীর চরণতরণী আশ্রয় করিয়া বিষয়-নক্র-মকরাদি-সঙ্কুল কামসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য কাতর প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর নিকট যুক্তবৈরাগ্যাশ্রয়, বিষয় হইতে উদ্ধার-লাভ-পূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্মে সমর্পণ করিবার জন্য শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর নিকট কাতর প্রার্থনা এবং শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর নিকট তাঁহার সিদ্ধান্ত-সলিলের দ্বারা কুতর্কানল নির্ব্বাপণ করিবার বিজ্ঞপ্তি জানাইয়াছেন। আবার—

"কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী॥"

বলিতে বলিতে যোগমায়ার কৃপা প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন। লালসাময়ী প্রার্থনায় গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় বৃন্দাবনধাম আশ্রয় করিয়া অনুক্ষণ যুগলসেবা-লালসার সন্ধান দিয়াছেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় উপাধি-রহিত-রতি ও সিদ্ধদেহের লালসা প্রকট করিয়াছন। লোকাপেক্ষা-রহিত হইয়া কেবল সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গে নিরন্তর কৃষ্ণসেবা প্রার্থনা করিতে করিতে বলিতেছেন—

"শ্রীগুরুচরণামৃত-মাধ্বিক-সেবনে।
মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণগুণ গা'ব বৃন্দাবনে॥
কর্ম্মী, জ্ঞানী, কৃষ্ণদ্বেষী বহির্ম্মুখ-জন।
ঘৃণা করি' অকিঞ্চনে করিবে বর্জ্জন॥
কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ করিবে সিদ্ধান্ত।
আচার-রহিত এই নিতান্ত অশান্ত॥
বাতুল বলিয়া মোরে পণ্ডিতাভিমানী।
ত্যজিবে আমার সঙ্গ মায়াবাদী জ্ঞানী॥
কুসঙ্গ-রহিত দেখি' বৈষ্ণব-সুজন।
কৃপা করি' আমারে দিবেন আলিঙ্গন॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাভাগবত-দর্শনে বলিতেছেন—

"কবে আমি আচণ্ডালে করিব প্রণতি।
কৃষ্ণভক্তি মাগি' ল'ব, করিয়া মিনতি॥"

আবার শ্রীল রঘুনাথের "ব্রজবিলাস স্তবে"র ন্যায় ব্রজের বিভিন্ন লীলাস্থলীর সেবা কবিবার লৌল্য প্রকাশ করিতেছেন; কখনও বৈষ্ণবে রতি-প্রার্থনা, কখনও বা কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম বৈষ্ণব চিনিবার যোগ্যতা-প্রার্থনা ও বৈষ্ণবের কৃপায় 'আমি বৈষ্ণব'—এইরূপ প্রতিষ্ঠাশা হইতে মুক্ত হইয়া বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজী কুক্কুরত্ব-প্রার্থনা, জড়-আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বৃন্দাবনাভিন্ন নবদ্বীপে বাস-প্রার্থনা; নবদ্বীপের মধ্যে আবার কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুম-কাননের বৈশিষ্ট্য-উপলব্ধি, গৌর-নিত্যানন্দের কৃপা-বলে গৌর-বনে ব্রজ-বনের শোভা-দর্শন এবং নবদ্বীপের গ্রামে-গ্রামে ধামবাসীর গৃহে মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া অনুক্ষণ 'শ্রীগৌর-গদাধর' ও 'শ্রীরাধা-মাধব' নাম বিপ্রলম্ভের সহিত উচ্চারণ করিতে করিতে জীবন যাপন করিবার শিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কল্যাণকল্পতরুর 'বিজ্ঞপ্তি'র মধ্যে শ্রীগোপীনাথের প্রতি নিবেদন-সমূহ বিপ্রলম্ভের আর্ত্তিরসে অভিষিক্ত। যখন জীব গোপীনাথের পাদপদ্মে এইরূপ আর্ত্তিবিশিষ্ট হয়, তখনই তাহার জন্ম-জন্মান্তরের অপরাধ ও ভোগলিপ্সাজনিত পাষাণতুল্য হৃদয় বিগলিত হইতে পারে। কেবল এই গোপীনাথ-গীতিগুলি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে অকপটে গান করিলেই জীব অনায়াসে জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহার আর অন্য কোন প্রকার সাধন-ভজনের প্রয়োজন হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার—(১) সংপ্রার্থনাময়ী, (২) দৈন্যবোধিকা ও (৩) লালসাময়ী—

সংপ্রার্থনাময়ী দৈন্যবোধিকা লালসাময়ী।
ইত্যাদির্বিবিধা ধীরৈঃ কৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তিরীরিতা॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।৬৫)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'কল্যাণকল্পতরু'তে এই ত্রিবিধ বিজ্ঞপ্তিই প্রকাশ করিয়াছেন। লালসাময়ী প্রার্থনার দশম ও একাদশ সঙ্গীতে গদাই-গৌরাঙ্গ ও রাধা-মাধবের ঐক্য-দর্শন ও গোদ্রুম-বনে তাঁহার স্বভজনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। "কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া"—'কল্যাণকল্পতরু'র এই লালসাময়ী প্রার্থনার দ্বাদশ সঙ্গীতটী 'শরণাগতি'র সিদ্ধি-লালসা—"কবে গৌর-বনে সুরধুনী তটে" সঙ্গীতটীর তুল্য ভাব-ব্যঞ্জক। 'বিজ্ঞপ্তি' বৈধী ভক্তিতে চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম; আবার অধিকার-ভেদে তাহা বিপ্রলম্ভরসাত্মিক হইয়া মুক্তকুলেরও ভজনাঙ্গ-বিশেষ।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিজ্ঞপ্তিতে যে 'গোপীনাথ' বলিয়া পুনঃ পুনঃ সম্বোধন করিয়াছেন, তাহা শ্রীল রঘুনাথের মনঃশিক্ষার—

মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং মন্নাথত্বে তদতুল-সখীত্বে তু ললিতাম্।
বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ॥
(মনঃশিক্ষা—৯)

এই শ্লোকের 'মদীশানাথত্ব'-বিচারমূলেই "আমার প্রভুর প্রভু"—এই ভাগবত-বচন দৃষ্ট হয়। আমার (ভক্তিবিনোদের)

প্রভুর (গোপীর) প্রভু (নাথ)—গোপীনাথ। দৈন্যার্ত্তিময় (বিপ্রলম্ভের) সেবকের "আমার প্রভুর প্রভু" বিচারেই 'ভরসা'। এইজন্যই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'গোপীনাথ' নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে বিজ্ঞপ্তি জানাইয়াছেন।

'উচ্ছ্বাস'-কীর্ত্তনের মধ্যে প্রথম নাম-কীর্ত্তন, তৎপরে রূপ-কীর্ত্তন, তৎপরে গুণ-কীর্ত্তন, তৎপরে লীলা-কীর্ত্তন, রস-কীর্ত্তন—এই ক্রম রক্ষিত হইয়াছে। নাম-কীর্ত্তনে অধিকার লাভের পূর্ব্বেই যাঁহারা রূপ-কীর্ত্তন বা লীলা-কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা রূপানুগ-বিরুদ্ধ প্রাকৃত-সহজিয়া-বিচারে ধাবিত হন এবং কীর্ত্তনের ফল লাভ করিতে পারেন না। নাম-কীর্ত্তনের মধ্যে আবার পূর্ব্বে গৌর-কীর্ত্তন, পরে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন মহাজনের অনুমোদিত—এই ক্রম কল্যাণ-কল্পতরুতে সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হইয়াছে। রূপ-কীর্ত্তনেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নামকেই রূপময় বলিয়াছেন অর্থাৎ নামের দ্বারাই রূপ বর্ণন করিয়াছেন এবং সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত রূপ-বর্ণনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। রূপ-কীর্ত্তনের এই পদটিই তাহার প্রমাণ—

"ইন্দ্রনীল জিনি, কৃষ্ণরূপ খানি,
হেরিয়া কদম্ব-মূলে।
মন উচাটন, না চলে চরণ,
সংসার গেলাম ভুলে॥"

অধিকারি-জনের জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রূপ-কীর্ত্তনের মধ্যে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বকে উদ্‌ঘাটিত করাইয়াছেন; লীলা-

কীর্ত্তনের মধ্যেও কৃষ্ণতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি করাইয়াছেন ; কৃষ্ণলীলার তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন ; যেমন—

"কর্ম্মবন্ধ জ্ঞানবন্ধ, আবেশে মানব অন্ধ,
তারে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম-মধু দিয়া, অন্ধভাব ঘুচাইয়া,
চরণে করেন অনুচর ॥
বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা-রত্ন দানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগ-বশবর্ত্তী হ'য়ে, পারকীয়-ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ॥"

ক্রমে রস-কীর্ত্তনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বারসিক-পরিচয় সুমেধোগণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে যামুন-তটগতি ও বিপ্রলম্ভমূলে সেবার জন্য অভিসার বা কৃষ্ণানুসন্ধানের আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। এই পর্য্যন্তই সাধক-জীবের শ্রবণের অধিকার। রাগাত্মক গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে রাগানুগ-জীব শ্রোতৃবৃন্দের নিকট ঐ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিতে পারেন। তাহার পরের অধিকার-বৈশিষ্ট্যের কথা ভাষাদ্বারা অনধিকারী তত্ত্ববিচারানভিজ্ঞ সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করা যায় না। এইজন্য ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরুর রস-কীর্ত্তনের উপসংহারে বলিতেছেন—

"কেন মোর দুর্ব্বলা লেখনী নাহি সরে।
অভিসার আরম্ভিয়া সকম্প অন্তরে॥
মিলন, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভাদি বর্ণন।
প্রকাশ করিতে নাহি সরে মম মন॥
দুর্ভাগা না বুঝে রাস-লীলা-তত্ত্বসার।
শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তাহার॥
অধিকারহীন-জন-মঙ্গল চিন্তিয়া।
কীর্ত্তন করিনু শেষ, কাল বিচারিয়া॥"

গীতমালা

"যামুনভাবাবলী"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'গীতমালা'-গ্রন্থ শুদ্ধ বৈষ্ণব ও রূপানুগ গৌড়ীয়গণের ভজনের রত্নখনি। ইহার প্রথম সাতাশটী সঙ্গীত 'যামুনভাবাবলী' বা শান্ত-দাস্য-ভক্তিসাধন-লালসাময়ী গীতিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তৎপরে 'কার্পণ্য পঞ্জিকা' বা 'বিজ্ঞপ্তি-নিবেদন' নামক গীতি, ইহার পর 'শোক-শাতন', তৎপরে 'শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ' এবং সর্ব্বশেষে 'সিদ্ধিলালসা'র অন্তর্গত দশটী গীতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যামুনভাবাবলীর সঙ্গীত-সমূহ শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্য্য শ্রীযামুনাচার্য্যের স্তোত্ররত্নের ভাবানুসরণে রচিত। এই সকল শান্ত ও দাস্য-ভাবের সঙ্গীত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশিত মধুর ভাবে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-ভাব অনুস্যূত আছে। শান্ত ও দাস্যরস মধুর রসের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তির কথাজগতে প্রচার করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথমে শ্রী-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মহাত্মগণের চরিত্র ও শিক্ষা আলোচনা করিয়াছেন। 'শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী'র প্রথম খণ্ডে আমরা শ্রী-সম্প্রদায়ের কতিপয় পূর্ব্বাচার্য্যের চরিত্র অনুশীলন করিবার সুযোগ পাইয়াছি। 'শ্রীযামুনচার্য্য' নামক প্রবন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"শ্রীশঠকোপ যে বৈষ্ণবধর্ম্ম তদীয় শিষ্য মধুর কবিকে দিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীপরাঙ্কুশের নিকট হইতে শ্রীমন্নাথমুনি প্রাপ্ত হন। শ্রীনাথের প্রিয় শিষ্য পুণ্ডরীক শ্রীনাথ-কথিত শঠকোপ-মত তদীয় শিষ্য রামমিশ্রের নিকট রাখিয়া স্বধাম প্রাপ্ত হন। রামমিশ্র যামুনাচার্য্যকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। যামুনাচার্য্যের নিকট হইতে গোষ্ঠীপূর্ণ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করেন। গোষ্ঠী-পূর্ণের শিষ্য—রামানুজ।"

—(শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী প্রথম খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা।)

শ্রীযামুনাচার্য্যের অপর নাম—আলবন্দারু ঋষি। তাঁহার রচিত স্তোত্ররত্ন হইতে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু প্রভৃতি গৌড়ীয় মহাজনগণ বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই স্তোত্ররত্নের বিভিন্ন স্তোত্রের ভাব লইয়া তাঁহার গীতমালার "যামুনভাবাবলী" জগতে প্রকট করিয়াছেন। শ্রীযামুনাচার্য্যের স্তোত্ররত্নের ভাবানুসরণে গীতমালার লালসা-গীতি-সমূহ কিরূপ-ভাবে গ্রথিত হইয়াছে, নিম্নে আমরা উহার কএকটী নিদর্শন দিতেছি। শ্রীযামুনাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"বশী বদান্যো গুণবানৃজুঃ শুচি-
র্ম্মৃদুর্দয়ালুর্ম্মধুরঃ স্থিরঃ সমঃ।
কৃতী কৃতজ্ঞস্ত্বমসি স্বভাবতঃ
সমস্তকল্যাণগুণামৃতোদধিঃ॥

—(স্তোত্ররত্ন—২০)

ইহার ভাবানুসরণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যামুনভাবাবলীর পঞ্চম সঙ্গীতে গাহিয়াছেন—

"হরি হে!

তুমি সর্ব্বগুণযুত, শক্তি তব বশীভূত,
বদান্য, সরল, শুচি, ধীর।
দয়ালু, মধুর, সম, কৃতী, স্থির, সর্ব্বোত্তম,
কৃতজ্ঞ-লক্ষণে পুনঃ বীর॥
সমস্ত কল্যাণ-গুণ- গণামৃত-সম্ভাবন,
সমুদ্রস্বরূপ ভগবান্।
বিন্দু বিন্দু গুণ তব, সর্ব্বজীব-সুবৈভব,
তুমি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্॥
এ ভক্তিবিনোদ ছার, কৃতাঞ্জলি বার বার,
করে চিত্তকথা বিজ্ঞাপন।
তব দাসগণ-সঙ্গে, তব লীলাকথা-রঙ্গে,
যায় যেন আমার জীবন॥"

(গীতমালা, যামুনভাবাবলী—৫)

শ্রীযামুনাচার্য্য লিখিয়াছেন—

ন নিন্দিতং কর্ম্ম তদস্তি লোকে
সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি।
সোঽহং বিপাকাবসরে মুকুন্দ
ক্রন্দামি সম্প্রত্যগতিস্তবাগ্রে॥

(স্তোত্ররত্ন—২৫)

ইহার ভাবানুসরণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই, যাহা আমি করি নাই,
সহস্র সহস্রবার হরি !
সেই সব কর্ম্মফল, পেয়ে অবসর বল,
আমায় পিশিছে যন্ত্রোপরি ॥
গতি নাহি দেখি আর, কাঁদি হরি অনিবার,
তোমার অগ্রেতে এবে আমি ।
যাঁ তোমার হয় মনে, দণ্ড দেও অকিঞ্চনে,
তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী ॥
ক্লেশভোগ ভাগ্যে যত, ভোগ মোর হউ তত,
কিন্তু এক মম নিবেদন ।
যে যে দশা ভোগি আমি, আমাকে না ছাড় স্বামি !
ভক্তিবিনোদের প্রাণধন ॥"

(গীতমালা, যামুনভাবাবলী—৯)

স্তোত্ররত্নের প্রসিদ্ধ সুমধুর একটী শ্লোক এই—

তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং
ভবনেষ্বস্ত্বপি কীটজন্ম মে ।
ইতরাবসথেষু মাস্ম ভূ-
দপি মে জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা ॥

(স্তোত্ররত্ন—৫৭)

ইহার ভাবানুসরণে গীতমালার যামুনভাবাবলীর ২২শ সংখ্যক গীতিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"তবে এক কথা মম, শুন হে পুরুষোত্তম,
তবদাস-সঙ্গি-জন-ঘরে।
কীটজন্ম যদি হয়, তাহাতেও দয়াময়,
রহিব হে সন্তুষ্ট অন্তরে॥
তব দাস-সঙ্গহীন যে গৃহস্থ অর্ব্বাচীন,
তা'র গৃহে চতুর্ম্মুখ ভূতি।
না হউ, কখন হরি! করদ্বয় যোড় করি',
করে ভক্তিবিনোদ মিনতি॥"

শরণাগতিতেও ঠিক এইরূপ ভাবের অনুসরণে কএকটী পদ দেখিতে পাওয়া যায়—

"কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ-ব্রহ্ম-জন্মে নাহি আশ॥"
(শরণাগতি—১১)

স্তোত্ররত্নের নিম্নলিখিত পদটী অনুসরণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের যামুনভাবাবলীর ২৬শ সংখ্যক গীতি ও শরণাগতির "জনক-জননী-দয়িত-তনয়। প্রভু-গুরু-পতি তুঁহু সর্ব্বময়"—এই সঙ্গীতটী রচিত হইয়াছে।

পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িত-তনয়স্ত্বং প্রিয়সুহৃৎ
ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরপি গতিশ্চাসি জগতাম্।

৫—

তদীয়স্ত্বদ্ভৃত্যস্তব পরিজনস্তদ্গতিরহং
প্রপন্নশ্চৈবং সত্ত্বহমপি তবৈবাস্মি হি ভবঃ ॥

(স্তোত্ররত্ন ৬২)

তুমি জগতের পিতা, তুমি জগতের মাতা,
দয়িত, তনয় হরি তুমি।
তুমি সুহৃন্মিত্র গুরু, তুমি গতি কল্পতরু,
তদীয় সম্বন্ধ মাত্র আমি ॥
তব ভৃত্য পরিজন- গতি-প্রার্থী অকিঞ্চন,
প্রপন্ন তোমার শ্রীচরণে।
তব সত্ত্ব তব ধন, তোমার পালিত জন,
আমার মমতা তব জনে ॥
এ ভক্তিবিনোদ কয়, অহংতা মমতা নয়,
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-অভিমানে।
সেবার সম্বন্ধ ধরি, অহংতা মমতা করি,
তদিতর প্রাকৃত বিধানে ॥

(গীতমালা, যামুনভাবাবলী—২৬)

"কার্পণ্য-পঞ্জিকা"

গীতমালায় 'কার্পণ্য-পঞ্জিকা' বা 'বিজ্ঞপ্তি-নিবেদন' শ্রীরূপের কার্পণ্য-পঞ্জিকার অনুসরণে লিখিত। কার্পণ্য-পঞ্জিকার গীতি-সমূহে শ্রীল ভক্তিবিনোদ তাঁহার ঐকান্তিক-রূপানুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন। 'কার্পণ্য'-শব্দের অর্থ—'দৈন্য,' 'পঞ্জিকা'—প্রস্তাবনা।

কার্পণ্য-পঞ্জিকায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজেশ্বরী শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী ও ঈশানাথ শ্রীকৃষ্ণকে অতি দৈন্যভরে ব্রজের কুঞ্জে বাস করিয়া বিজ্ঞপ্তি-নিবেদন করিতেছেন। এই নিবেদনে ঈশা ও ঈশানাথের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঠাকুর দৈন্যভরে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিকট এইরূপভাবে নিজ-অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"তোমাদের কৃপা পাই, এরূপ যোগ্যতা নাই,
যদিও আমার ব্রজবনে।
তুঁহে মহাকৃপাময়, জানি' কৈনু পদাশ্রয়,
কৃপা কর, এ অধম জনে॥
কেবল অযোগ্য নহি, অপরাধী আমি হই,
তথাপি করহ কৃপা দান।
লোকে কৃপাবিষ্ট জন, ক্ষমে অপরাধগণ,
তুমি তুঁহে মহা কৃপাবান্॥
কৃপাহেতু ভক্তিসার, লেশাভাস নাহি তা'র,
কৃপা-অধিকারী নহি আমি।
তুঁহে মহালীলেশ্বর, হঞা সেই লীলাপর,
কৃপা কর ব্রজ-জন-স্বামি॥
(গীতমালা—কার্পণ্য-পঞ্জিকা)

এই কার্পণ্য-পঞ্জিকায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদের ন্যায় জীবের স্বভাব অতি সজীব ভাষায় বর্ণন করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের

শ্রীচরণে কিরূপভাবে নিজ-অযোগ্যতা নিষ্কপটে জ্ঞাপন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। হৃদয়ে স্বাভাবিক-ভাবে এইরূপ কার্পণ্য বা দৈন্য উপস্থিত না হইলে জিহ্বায় কখনও শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত শব্দাবতার শ্রীনামের উদয় হয় না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"অধমে উত্তম মানি,' মূঢ়, বিজ্ঞ, অভিমানী,
তুষ্ট হঞা শিষ্ট-অভিমান।
এই দোষে দোষী হঞা, গেল চিরদিন বঞা,
না করিনু ভজন-বিধান॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কার্পণ্য-পঞ্জিকার মধ্যে যে-সকল আর্ত্তি-গীতি গাহিয়াছেন, তাহা একটুকু সেবোন্মুখ-চিত্তে শ্রবণ করিলে অতি পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়। ঠাকুরের অমৃত-প্রবাহ-ভাষ্যের (চৈঃ চঃ ম ৪।১৯৭) উক্তি—"মথুরা রাজ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণ-ভজন করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম। এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীন-জ্ঞানে দীন-দয়ার্দ্র-নাথকে এই ভাবে ডাকিবেন। জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত-ভাবই স্বাভাবিক ভজন।"

কার্পণ্য-পঞ্জিকায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সেই চিত্তবৃত্তি পরি-পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—

"প্রাচীনাশা, ফলপূর্ত্তি, তুঁহু পদাম্বুজ-স্ফূর্ত্তি,
সেই তুঁহুজন-দরশন।

এ জন্মে কি হ'বে মন, এ উৎকণ্ঠা সুবিষম,
বিচলিত করে মম মন ॥
(গীতমালা—কার্পণ্য-পঞ্জিকা)

"শোকশাতন"

গৃহস্থগণের শোকের কারণ উপস্থিত হইলেও তাঁহারা কিরূপ অবিক্লব-মতি হইয়া গুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিবেন বা মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-রাসের সেবা করিবেন, গীতমালার 'শোক-শাতনে' তাহার আদর্শ শিক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহস্থগণকে অশোক-কৃষ্ণপাদপদ্মে মতিমান করিবার জন্য শোকশাতনে সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রাণস্পর্শী উপদেশ-সমূহ কীর্ত্তিত হইয়াছে। সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হইলে শোকাদি-ধর্ম্ম অনায়াসে বিদূরিত হয়।

বৈষ্ণব-গৃহস্থ কৃষ্ণের সংসার করেন, তিনি মায়ার সংসার করেন না। 'কৃষ্ণের সংসার' অর্থই—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সংসার। সেই সংসারের প্রভু—শ্রীকৃষ্ণ-নাম। শুদ্ধবৈষ্ণব কখনও নিজেকে 'প্রভু' অভিমান করেন না। কৃষ্ণনামকে সংসারের প্রভু বলিয়া উপলব্ধি হইলে শোক-মোহাদি-ধর্ম্ম আক্রমণ করিতে পারে না, তখন সমস্তই কৃষ্ণের সেবার অনুকূল ব্যাপাররূপে পরিদৃষ্ট হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যভাগবতের (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৫শ পঃ) শ্রীবাস-পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তির প্রসঙ্গই আত্ম-মঙ্গলের উপদেশাবলীতে সুবলিত করিয়া গীতমালায় "শোকশাতন" আখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। 'শাতন' শব্দের অর্থ—বিনাশন। এই 'শোক-

শাতন'কে করুণ-গম্ভীর ভক্তিসিদ্ধান্তগর্ভ—"পালাগান" বলা যাইতে পারে। শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় ভক্তিবিনোদের গীতিতে মহাপ্রভুর নিকট শরণাগত আদর্শ-বৈষ্ণব-গৃহস্থের অন্তরের প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

"ওহে প্রাণেশ্বর, এ হেন বিপদ,
প্রতিদিন যেন হয়।
যাহাতে তোমার, চরণ-যুগলে,
আসক্তি বাড়িতে রয়॥
বিপদ-সম্পদে, সেই দিন ভাল,
যে-দিন তোমারে স্মরি।
তোমার স্মরণ- রহিত যে-দিন,
সে-দিন বিপদ হরি॥"

শোকশাতনের উপসংহারে গুরুবর্গের আশীর্ব্বাদরূপ ভক্তিসূচক উপাধিকে যাহারা অপব্যবহার করিয়া থাকে অর্থাৎ গুরুবর্গের প্রদত্ত আশীর্ব্বাদে হৃদয়ের অকপট দৈন্য, আর্ত্তি ও বিপ্রলম্ভময় চিত্তবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবার পরিবর্ত্তে যাহাদের হৃদয়ে 'বড় আমি', 'বৈষ্ণব আমি' অভিমান উপস্থিত হয় এবং যাহারা উত্তরোত্তর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা-লোলুপ, দাম্ভিক হইয়া পড়ে, তাহাদের মন্দভাগ্যকে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ সর্ব্বতোভাবে গর্হণ ও তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন—

"শ্রীগুরু-বৈষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি।
ভক্তিহীনে উপাধি এবে হইল ব্যাধি ॥
যতন করিয়া সেই ব্যাধি-নিবারণে
শরণ লইনু আমি বৈষ্ণব-চরণে ॥
বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে ধরিয়া।
এই শোকশাতন গায় ভক্তিবিনোদিয়া ॥"

"শ্রীশ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ"

গীতমালার রূপানুগ-ভজন-দর্পণের গীতি-সমূহে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির রস-বিচার-বিশ্লেষণ অধিকারীজনগণের জন্য প্রকট করিয়াছেন; সঙ্গীতের মধ্যে এরূপ অপ্রাকৃত অলঙ্কার ও রস-বিষয়ক বিচারের নিদর্শন দুর্ল্লভ। ভজন-দর্পণের প্রারম্ভেই রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথের অনুসরণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ, বৃন্দাবনের যুবদ্বন্দ্ব ও ব্রজবাসিজনের শ্রীচরণ-বন্দনা, শ্রীরূপের ঐকান্তিক আনুগত্য ও ব্রজবাসীর সেবাদর্শের প্রতি লোভের আরতি করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন যে, রূপানুগ-ভজনে প্রবেশ করিতে হইলে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-চেষ্টায় সম্পূর্ণ অনাস্থা এবং সর্ব্ব-প্রকার অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ একান্ত প্রয়োজন। এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর গাহিয়াছেন—

জ্ঞান, কর্ম্ম, দেব, দেবী, বহু যতনেতে সেবি;
প্রাপ্তফলে হৈলে তুচ্ছ জ্ঞান।

সাধুজন-সঙ্গাবেশে, কৃষ্ণকথার শেষে,
বিশ্বাস ত' হয় বলবান্ ॥
সেই ত' বিশ্বাসে ভাই, শ্রদ্ধা বলি' সদা গাই,
ভক্তিলতাবীজ বলি তারে।
কর্ম্মি-জ্ঞানী জনে যারে, শ্রদ্ধা বলে বারে বারে,
সেই বৃত্তি শ্রদ্ধা হইতে নারে ॥
নামের বিবাদ মাত্র, শুনিয়া ত' জলে গাত্র,
লৌহে যদি বলহ কাঞ্চন।
তবু লৌহ লৌহ রয়, কাঞ্চন ত' কভু নয়,
মণি-স্পর্শে নহে যতক্ষণ ॥"

শ্রদ্ধা দ্বিবিধ—বিধিমূলা শ্রদ্ধা ও রুচিমূলা শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা-ভেদে সাধন-ভক্তিও দ্বিবিধ—(১) বৈধী-সাধন-ভক্তি ও (২) রাগানুগা সাধন-ভক্তি। রাগানুগ-পথে যাঁহার স্বাভাবিক রুচি উপস্থিত হয়, তিনি রূপানুগ হইতে পারেন। রূপানুগ হইতে হইলে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব-জ্ঞানের অত্যাবশ্যকতা আছে। ভক্তিসিদ্ধান্ত ও রসতত্ত্বে অলস-ব্যক্তি কখনও রূপানুগ হইতে পারেন না, ইহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশেষভাবে জানাইয়াছেন—

"রূপানুগ তত্ত্বসার, বুঝিতে আকাঙ্ক্ষা যাঁ'র,
রসজ্ঞান তাঁ'র প্রয়োজন।
চিন্ময় আনন্দরস, সর্ব্বতত্ত্ব যাঁ'র বশ,
অখণ্ড পরম তত্ত্ব-ধন ॥"

(গীতমালা—রূপানুগ-ভজন-দর্পণ—৬)

এই অখণ্ড চিন্ময় আনন্দ-রসের একটু ভান নির্ব্বেদ-জ্ঞানিগণকে ব্রহ্মলয়ের জন্য উন্মত্ত করিয়াছে। ঐ অখণ্ড রসের একটু ছায়া কত কত ব্যক্তিকে ঈশ্বর-সাযুজ্যকামী যোগী ও ধর্ম্মার্থ-কামকামী কর্ম্মী করিয়াছে। স্থায়ীভাব-রতির সহিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই সামগ্রী-চতুষ্টয়ের মিলনে রসের প্রকট হয়। প্রপঞ্চে বা জড়কাব্যে যে রস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পরম রসেরই অসম্মূর্ত্তি; অতএব অনিত্য ও আদর্শের ছায়া—মরীচিকা বা আলেয়ার মত ছলনাময়।

ভজন-দর্পণের সপ্তম গীতিতে রসের মূল স্থায়ীভাব-রতির প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। স্থায়ীভাব-রতিই রস-উদ্দীপন-কার্য্যে মুখ্য আধার। ভক্তভেদে রতি পঞ্চ প্রকার; যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতি। রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পঞ্চ মুখ্যরস ও সপ্ত গৌণরসে বিভক্ত। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পাঁচটী মুখ্য ভক্তিরস; আর হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই সাতটী গৌণরস। তটস্থভাবে বিচার করিলে মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সাধনভক্তি হইতে রতির উদয় হয়। শ্রদ্ধা-বৃত্তি ক্রমশঃ উচ্চভাব ধারণ করিয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতি—এই সকল নামে পরিচিত হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুশীলনে সেই রতি যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই প্রেমাদি নাম ধারণ করে। প্রেম ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়।

স্থায়ীভাবই রসের মূল, বিভাব—রসের হেতু, অনুভাব—রসের

কার্য্য, সাত্ত্বিক ভাবও রসের কার্য্য-বিশেষ এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব—সকলই রসের সহায়। বিভাব দুই প্রকারে বিভক্ত—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন পুনরায় দুই প্রকারে বিভক্ত—বিষয় ও আশ্রয়। কৃষ্ণভক্তিরসে ভক্তই আশ্রয়, কৃষ্ণই বিষয় এবং কৃষ্ণের গুণগণই উদ্দীপন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ইহা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন এবং গীতমালায় তাহা পদ্যাকারে বর্ণন করিতেছেন—

"ভক্ত-চিত্ত-সিংহাসন, তা'তে উপবিষ্ট হন,
স্থায়ীভাব সর্ব্বভাব-রাজ।
হ্লাদিনী যে পরা শক্তি, তাঁ'র সার শুদ্ধভক্তি,
ভাবরূপে তাঁহার বিরাজ ॥"

আলম্বনরূপ বিভাবের মধ্যে বিষয়-নন্দনন্দনের রূপ, গুণ প্রভৃতি ভজন-দর্পণে বর্ণিত হইয়াছে। আলম্বন-বিভাবের আশ্রয়, কৃষ্ণ-বল্লভাগণের স্বরূপ ও সেবা, নায়িকাগণের অষ্ট অবস্থা, প্রধানা নায়িকা শ্রীমতী রাধিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, রাধিকার সখীগণের নাম ও সেবা, সখীগণের পরস্পর ভাব প্রভৃতি বর্ণন করিয়া ত্রয়োদশ প্রকার অনুভাব, অষ্ট প্রকার সাত্ত্বিক ভাব ও তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব, ভাবাবস্থা প্রাপ্ত স্থায়ী ভাবের উত্তরদশা, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভভেদে উজ্জ্বল রসের বিভাগ, সম্ভোগের প্রকার, উজ্জ্বল-রসাশ্রিত-লীলা প্রভৃতি বর্ণন করিয়া ঠাকুর ভজন-দর্পণের উপসংহারে ব্রজলীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সান্তর ও নিরন্তর-ভেদে নিত্যলীলার দ্বিবিধ বৈচিত্র্য সর্ব্বশেষে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সিদ্ধিলালসা

গীতমালার সিদ্ধিলালসায় দশটী সঙ্গীত দৃষ্ট হয়। প্রথম সঙ্গীতে গৌর-জন শ্রীল ভক্তিবিনোদ গৌরবন ও ব্রজবনের অভিন্নতা-দর্শন-লালসা শিক্ষা দিয়াছেন—

(কবে) "গৌর-ব্রজবনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।
(তখন) ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী ॥"

গৌরবনে রাধাবন দর্শন না হইলে রাধা-দাস্য লাভ হয় না। চিত্তে গৌরবনের সেই স্বরূপ-স্ফূর্ত্তিই সিদ্ধির পরিচয়। যাহার ব্রজ-দর্শন হয়, তাহার আর মাংস-দর্শন থাকে না—

"দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে,
নিজ-স্থূল-পরিচয়।
নয়নে হেরিব, ব্রজপুর-শোভা,
নিত্য-চিদানন্দময় ॥"

(সিদ্ধিলালসা—২)

গুর্ব্বপরাধী, এঁচড়ে পাকাদলের কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গীতমালার উপসংহারে অষ্টম গীতিতে যখন নিজ-সিদ্ধস্বরূপের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তখন উহার অনুকরণ করিয়া যে-কেহ সিদ্ধ-প্রণালীর কথা হাটে-বাজারে প্রচার করিলে

তাহা 'অপরাধ' বলিয়া গণ্য হইবে না। বস্তুতঃ গুর্ব্বপরাধিগণের জানা প্রয়োজন যে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত গীতিতে গুরুরূপা সখীর চরণে নিজ-স্বারসিকী স্থিতি প্রার্থনা করিয়াছেন, যথা—

"সখীর চরণে কবে করিব আকুতি।
সখী কৃপা করি' দিবে স্বারসিকী স্থিতি॥

* * *

কবে বা এ দাসী, সংসিদ্ধি লভিবে,
রাধাকুণ্ডে বাস করি'।
রাধাকৃষ্ণসেবা সতত করিবে,
পূর্ব্ব স্মৃতি পরিহরি॥"

পূর্ব্ব-স্মৃতি বা পূর্ব্ব-ইতিহাস—সমস্তই বিস্মৃত হইয়া স্বারসিকী স্থিতির জন্য একান্ত লৌল্য ও তজ্জন্য শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রার্থনা এক কথা, আর "গুরুদেব আমাকে সিদ্ধ-প্রণালী দিয়াছেন, আমার নাম অমুক মঞ্জরী"—ইহা জানাইয়া জগতের নিকট হইতে তদ্-বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা আহরণ করা আর এক কথা। যে-ব্যক্তি সিদ্ধ-প্রণালী প্রাপ্ত হইয়া সত্য-সত্যই "গুরুপ্রেষ্ঠ" হইতে পারিয়াছেন, সেই ব্যক্তির বিষয়-পিপাসা, পুরুষাভিমান, মৎসরতা, গুরুদেবে জাতিবুদ্ধি, স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি ষোল আনা আসক্তি কখনও থাকিতে পারে না। কপটতা করিয়া নিজেকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমকক্ষ বলিয়া জগতে প্রচার করিতে গেলে সেই অপরাধের সীমা নাই। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীরূপানুগবর

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ভক্তিসন্দর্ভের নিম্নলিখিত বাক্য তাঁহার গীতমালায় লঙ্ঘন করেন নাই, বরং তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিপালনই করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর শিক্ষা এই—

"অত্র চ শ্রীগুরোঃ শ্রীভগবতো বা প্রসাদলব্ধং সাধন-সাধ্যগতং স্বীয়সর্ব্বস্বভূতং যৎকিমপি রহস্যং তত্তু ন কস্মৈচিৎ প্রকাশনীয়ম্; যথা—(ভাঃ ৮।১৭।২০)—

নৈতৎ পরস্মা আখ্যেয়ং পৃষ্টয়াপি কথঞ্চন।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্॥
(ভক্তিসন্দর্ভ—৩৩৯ সংখ্যা)

অর্থাৎ ইহার মধ্যে শ্রীগুরু বা শ্রীভগবানের প্রসাদে সাধন-সাধ্যগত স্বীয় সর্ব্বস্বভূত যে রহস্য অবগত হওয়া যায়, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ্য নহে। যথা—

হে দেবি! কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও এই তত্ত্ব অন্যকে বলিবে না। দেবগণের রহস্য সমস্ত সুগুপ্ত হইলেই ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদের স্বারসিকী সিদ্ধি এক মহা আশ্চর্য্য ব্যাপার। ভক্তিবিনোদ সিদ্ধির লালসায় যেমনটী ইচ্ছা করিয়াছেন, সিদ্ধি-লালসায় যে লৌল্য-গীতিটী গাহিয়াছেন, নিত্যসিদ্ধ ভক্তি-বিনোদের অপ্রকট-লীলা-প্রবেশের কালে ঠিক সেই সিদ্ধিলালসা-টীই মূর্ত্তিমতী সিদ্ধিরূপে আত্ম-প্রকট করিয়াছেন। ভক্তিবিনোদ গীতমালার সিদ্ধিলালসার ষষ্ঠ গীতে গাহিয়াছেন—

"সাক্ষাৎ দর্শন, মধ্যাহ্ন লীলায়,
রাধাপদ-সেবার্থিনী।
যখন যে সেবা, করহ যতনে,
শ্রীরাধা-চরণে ধনি॥"

শ্রীরাধাকুণ্ডাভিন্ন শ্রীগোদ্রুমের নিত্য-মধ্যাহ্ন-লীলায়ই ভক্তি-বিনোদ প্রবেশ করিয়াছেন।

ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'নবদ্বীপশতকে'ও গাহিয়াছেন—

"রাধাকুণ্ড শ্রীগোদ্রুমে শ্রীরাধার সহ।
বিহার সময়ে তব পাদপদ্ম লহ ॥"

বাউল-সঙ্গীত

ভক্তিবিনোদ mass বা সাধারণ জনমণ্ডলীর জন্য কতকগুলি সরল অথচ চরমতত্ত্বোপদেশপূর্ণ অসৎসিদ্ধান্ত ও অসৎসঙ্গ-নিরাসক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার "বাউল-সঙ্গীত" ও "দালালের গীত" প্রভৃতি সে-জাতীয় গান। এক সময় বঙ্গদেশ বাউল-সঙ্গীতের ঝঙ্কারে মাতিয়া উঠিয়াছিল। এখনও পল্লীর মজুর, চাষী, দোকানী, নাবিক, জনসাধারণ বাউল-সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় সাড়া দেয়। এমন কি, পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত আভিজাত্যবাদিগণের দরবারেও বাউল-সঙ্গীতের সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। গণশিক্ষার পক্ষে সহজ-গ্রাম্যভাষা ও যুক্তিগর্ভ বাউল-সঙ্গীতগুলি খুব উপযোগী। কিন্তু জনসাধারণ রাগিণী ও ভাষার ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া প্রচলিত বাউল-সঙ্গীতগুলির মধ্যেও বাউল-গানের বিচারে কি কি তত্ত্ববিরোধ রসাভাস, সম্ভোগবাদ ও মায়াবাদাদি মারাত্মক বিষ ভক্তি-দেবীর চরণে বিবিধ অপরাধরূপে মিশ্রিত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে না। অদ্বিতীয় ভোক্তা অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণে 'বাতুল' বা 'বাউল' না হইয়া অনাদি-বহির্ম্মুখতা বিশ্বকে স্থূল ও

সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের ভোগ-লালসায় 'বাতুল' করিয়া তুলিয়াছে। তাই প্রচলিত বাউল-সঙ্গীতের মধ্যে ভক্তির নামে কতটা সম্ভোগবাদ বা একচ্ছত্র সম্ভোগবিগ্রহ কৃষ্ণের অনুকরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি ও পাষণ্ডতা নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাহারা আদৌ ধরিতে পারে না। কিন্তু কুন্‌কী হাতী দিয়া যেরূপ মদমত্ত বন্য হস্তীকে ধরিয়া পোষ-মানান হয়, তদ্রূপ সম্ভোগমদমত্ত আমাদিগকে অহৈতুকী শুদ্ধ-ভক্তিদেবীর সেবায় পোষ মানাইবার জন্য পরদুঃখদুখী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাউল-সঙ্গীত ও নামহট্টের দালালের গীতি-সমূহ রচনা করিয়াছেন। ইহা সাধারণ জনমণ্ডলীর প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনর্পিতচর অবদান।

ভক্তিবিনোদ বাউল-সঙ্গীতের মধ্যে আপনাকে "চাঁদবাউল" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই চাঁদবাউল সত্য-সত্যই নিতাই-চাঁদ ও গোরাচাঁদের সেবার বাতুল ও তাঁহাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত-সাম্রাজ্য-সংরক্ষক মহাজন। চাঁদবাউল সম্ভোগমদমত্ত বাউল গণকে বাউল-সঙ্গীতের মধ্যে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন—

"বাউল বাউল' ব'ল্‌ছে সবে, হচ্ছে বাউল কোন্ জনা।
দাড়ি-চূড়া দেখিয়ে (ও ভাই) ক'র্‌ছে জীবকে বঞ্চনা॥
দেহতত্ত্ব-জড়ের তত্ত্ব, তা'তে কি ছাড়ায় মায়ার গর্ত্ত,
চিদানন্দ পরমার্থ, জান্‌তে ত' তায় পার্‌বে না॥
যদি বাউল চাওরে হ'তে, তবে চল ধর্ম্মপথে,
যোষিৎসঙ্গ সর্ব্বমতে ছাড়রে মনের বাসনা॥

বেশ-ভূষা-রঙ্গ যত, ছাড়ি' নামে হওরে রত,
নিতাই চাঁদের অনুগত, হও ছাড়ি' সব দুর্ব্বাসনা ॥
মুখে 'হরেকৃষ্ণ' বল, ছাড়রে ভাই কথার ছল,
নাম বিনা ত' সুসম্বল, চাঁদবাউল আর দেখে না ॥"

সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ-প্রদান ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিত্য-সিদ্ধ স্বভাব। কাজেই বাউল-সঙ্গীত রচনা করিতে গিয়াও তিনি সেই স্বভাব পরিত্যাগ করেন নাই। সেখানেও তিনি 'দেহতত্ত্ব-জড়ের তত্ত্ব' প্রভৃতি কথার মধ্যে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন।

বাউলগণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণের সম্ভোগরসের অনুকরণ করিতে গিয়া স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহভজা বা মানুষভজা হইয়াছে। চণ্ডী-দাসের নামে বিকৃত ও প্রচলিত 'সবার উপরে মানুষ বড়' পদের বিকৃতার্থ করিয়া রিপুতাড়িত মনুষ্যগণ সকলের উপরে রিপুবশীভূত স্বজাতিকে অর্থাৎ মনুষ্য-জাতিকে সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইবার নজির পাইয়াছেন! কিন্তু তাহারা 'ভাল মানুষ' হইবার পরিবর্ত্তে 'বড় মানুষ' হইতে গিয়া মাংস-চর্ম্মে আসক্ত হইয়া পড়িতেছেন। 'সবার উপরে মানুষ বড়' স্বীকার করিয়া লইলেও তাহাকে কোন কোন বিশেষজ্ঞ "গূঢ়ঃ কপটমানুষ" শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অর্থ করেন। কিন্তু বহির্ম্মুখ সাহিত্যিক মানুষেরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। প্রাকৃত বাউলগণ সেই গূঢ় কপট-মনুষ্যের অনুকরণ করিতে গিয়া রক্ত-মাংসে ও যোষিৎসঙ্গে প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের কপটতা জনসাধারণকে জানাইবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইসব বাউল-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—

"মানুষ-ভজন ক'র্‌ছো ও-ভাই ভাবের গান ধ'রে।
গুপ্ত ক'রে রাখ্‌ছো ভাল, ব্যক্ত হ'বে যমের ঘরে ॥
মেয়ে হিজ্‌ড়ে, পুরুষ খোজা, তবে ত' হয় কর্ত্তাভজা,
এই ছলে ক'র্‌ছো মজা, মনের প্রতি চোখ ঠেরে ॥
'গুরু সত্য' ব'লছো মুখে, আছ তো ভাই জড়ের সুখে,
সঙ্গ তোমার বহির্ম্মুখে, শুদ্ধ হ'বে কেমন ক'রে ?
যোষিৎসঙ্গ-অর্থ-লোভে, মজে ত' জীব চিত্তক্ষোভে,
বাউলে কি সে-সব শোভে, আগুন দেখে' ফড়িং মরে ॥
চাঁদবাউল 'মিনতি করি,' বলে 'ও-সব পরিহরি,'
শুদ্ধভাবে বল হরি, যা'বে ভব-সাগর-পারে ॥

এও ত' এক কলির চেলা।
মাথা নেড়া কপ্নি পরা, তিলক নাকে গলায় মালা ॥
দেখ্‌তে বৈষ্ণবের মত, আসল শাক্ত কাজের বেলা।
সহজ ভজন ক'র্‌ছেন মামু, সঙ্গে ল'য়ে পরের বালা ॥
সখীভাবে ভজ্‌ছেন তারে, নিজে হয়ে নন্দলালা।
কৃষ্ণদাসের কথার ছলে, মহাজনকে দিচ্ছেন শলা ॥
নব রসিক আপনে মানি,' খাচ্ছেন আবার মনকলা।
বাউল বলে দোহাই ও-ভাই, দূর কর এ লীলা-খেলা ॥"

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, অতিবাড়ী, চূড়াধারী প্রভৃতি প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়—প্রচ্ছন্ন-সম্ভোগবাদী ও মায়াবাদী অপরাধী। ইহারা কলির চেলা।

ইহারা মহাজন, সৎশাস্ত্র, ভক্তিসিদ্ধান্ত, শুদ্ধ আচার ও বিচারের বিরোধী পাষণ্ড। ইহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সুন্দর যুক্তি-সমূহদ্বারা বাউল-সঙ্গীতে প্রদর্শন করিয়া কোমলশ্রদ্ধ, বিপথগামী ও পতনোন্মুখ জীবগণের প্রতি দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাউল-গণের সহিত এক শ্রেণীর বহির্ম্মুখ জনসাধারণের বিচার এই যে, 'মনে মনে' মালা জপাই ভাল। হরিনামের মালা বা ঝোলায় হরিনাম করা কিংবা ভক্তির কোনপ্রকার অঙ্গ পালন করার প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহাদের অন্তর্নিহিত বিচার এই—'আমাদের ব্যবহারিক কার্য্যগুলি সব বাহিরে হইবে, আর পারমার্থিক কার্য্যগুলি সমস্তই মনে মনে করিতে হইবে।' এইরূপ 'মনে মনে মনকলা খাওয়া'র মতবাদ বাউলগণের ন্যায় আমরাও অনেকেই ন্যূনাধিক পোষণ করি। এমন কি, কতকগুলি ভিন্ন দেশীয় ছড়ায়ও শুনিতে পাওয়া যায়—

"মালা জপে শালা, কর জপে ভাই।
যো মন্ মন্ জপে, উস্‌কো বলিহারী যাই ॥ "

ভক্তিবিনোদ বাউলগণের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট জন-সাধারণের এই প্রচ্ছন্ন দুষ্ট মতকে খণ্ডন করিয়া "চাঁদবাউল" সাজিয়া গান করিতেছেন—

"মনের মালা জপ্‌বি যখন মন,
কেন ক'র্‌বি বাহ্য বিসর্জ্জন।
মনে মনে ভজন যখন হয়,
প্রেম উথ্‌লে প'ড়ে বাহ্যদেহে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয় ;

আবার দেহে চ'রে, জপায় করে, ধরায় মালা অনুক্ষণ ॥
যে ব্যাটা ভণ্ড তাপস হয়,
বক বিড়াল দেখায়ে বাহ্য নিন্দে অতিশয় ;
নিজে জুৎ পেলে কামিনী-কনক করে সদা সংঘটন ॥
সে ব্যাটার ভিতর ফক্কাকার,
বাহ্য সাধন নিন্দা বই আর আছে কিবা তা'র,
(নিজের) মন ভাল দেখা'তে গিয়ে নিন্দে সাধু আচরণ ॥
শুদ্ধ করি' ভিতর বাহির ভাই,
হরিনাম কর্‌তে থাক, তর্কে কাজ নাই,
তোমার তর্ক ক'র্‌তে জীবন যা'বে চাঁদবাউল তায় দুঃখী হন॥

শ্রীভক্তিবিনোদ অকালপক্ক বা অকালে ভেকধারী ব্যক্তিগণকে কিরূপভাবে গর্হণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত বাউল-সঙ্গীতে জলন্ত-মূর্ত্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। অকালে আনুকরণিক বৈরাগ্যের ফলে জগতে নেড়া-নেড়ীর দলের ছড়াছড়ি ও আখ্‌ড়া বাঁধিয়া জঘন্যতম ব্যভিচারের স্রোত এক সময় বঙ্গসমাজে প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। একদিকে যেমন অত্যন্ত ঘর-পাগ্‌লামী বা গেহ-দেহাসক্তিজনিত গৃহি-বাউলগিরিকে ভক্তি-বিনোদ তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন, অপরদিকে অকালে ফল্গু-ত্যাগাভিনয়ের প্রদর্শনী-স্বরূপ ত্যাগি-বাউলগিরিকেও ভক্তি-বিনোদ তীব্রতম ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন —

কেন ভেকের প্রয়াস ?
হয় অকাল-ভেকে সর্ব্বনাশ।

হ'লে চিত্তশুদ্ধি, তত্ত্ববুদ্ধি, ভেক আপনি এসে হয় প্রকাশ ॥
তুমি শুদ্ধ চিদানন্দ, কৃষ্ণসেবা তোর আনন্দ,
পঞ্চ ভূতের হাতে প'ড়ে' হায় আছ একটী মেষ ;
এখন সাধুসঙ্গে, চিৎপ্রসঙ্গে, তোমার উপায় অবশেষ ॥
ভেক ধরি' চেষ্টা ক'রে, ভেকের জ্বালায় শেষে মরে,
নেড়ানেড়ি ছড়াছড়ি, আখ্ড়া বেঁধে বাস ;
অকাল কুষ্মাণ্ড, যত ভণ্ড, কর্ছে জীবের সর্ব্বনাশ ॥
শুক, নারদ, চতুঃসন, ভেকের অধিকারী হন,
তাঁ'দের সমান পার্লে হ'তে ভেকে ক'র্বে আশ ;
বল তেমন বুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি ক'জন ধরায় ক'র্ছে বাস ?
আত্মানাত্ম-স্ববিবেকে, প্রেমলতায় চিত্ত-ভেকে,
ভজন-সাধন-বারি-সেকে করহ উল্লাস ;
চাঁদবাউল বলে, এমন হ'লে হ'তে পার্বে 'কৃষ্ণদাস' ॥"

নামহট্ট ও দালালের গান

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জনসাধারণ বা massএর মধ্যে শুদ্ধভক্তির কথা সহজ ও সরল ভাষায় প্রচারের জন্য "নামহট্ট" খুলিয়াছিলেন এবং সেই নামের হাটে নিজে একজন সর্ব্বাপেক্ষা নীচ সেবক অর্থাৎ 'ঝাড়ুদার' মাত্র, এইরূপ পরিচয় দিয়া গ্রামে-গ্রামে দালাল অর্থাৎ প্রচারকের দ্বারা বেদ-বেদান্ত-ভাগবতের রহস্য-সমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত নিখিল বেদ-বেদান্ত আলোড়ন করিয়া যে রহস্যের কথা জগতে প্রচার করেন

নাই, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্কাদি আচার্য্যবৃন্দ বহুশাস্ত্র-গ্রন্থ ও ভাষ্যাদি রচনা করিয়া যে রহস্য-প্রচারের কথঞ্চিৎ উদ্দেশ করিয়াছিলেন, গৌর-জন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অতি সহজ ও সরল ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে সেই রহস্যের সার বিতরণের জন্য নামহট্ট খুলিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জনসাধারণের মধ্যে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য গীতাবলী-সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তিকালে জনৈক পদকর্ত্তা 'হাটপত্তন' শীর্ষক পয়ার-সমূহ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে আধুনিক যুগের উপযোগী যুক্তিমূলে কুসিদ্ধান্ত-নিরাস, বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মের মুখোসে যে-সকল বিদ্ধ-মতবাদ, ভণ্ডামী ও অপরাধ রাজত্ব করিতেছিল, তাহা সম্বন্ধ-জ্ঞানের উপদেশের সহিত নিরাকৃত করিবার পরিচয় ততটা পরিব্যক্ত হয় নাই।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনামহট্ট উন্মোচন করিয়া তাঁহার সম-সাময়িক যুগের বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানিসমূহকে যেমন একদিকে দূরীভূত করিয়াছেন, তেমনি অপরদিকে জনসাধারণকে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রাথমিক মূল বিষয়গুলি অতি সহজ ও সরল ভাষায় শিক্ষা দিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নামহট্টের স্বরূপ ও কার্য্য এই—

"নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥
(শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে)
প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণ-নাম সর্ব্বধর্ম্মসার ॥"

'হাট', 'মহাজন', 'দালাল', 'দস্তুরি', 'দণ্ডীদার', 'জমাদার', 'বিপণিপতি', 'মাতা', 'পিতা', 'ধন', 'প্রাণ', 'সংসার',—এই সকল শব্দ সাধারণ লোকে ধরিতে পারে। এইজন্য পরম কৃপালু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার নামহট্টে সে-সকল শব্দের মধ্য দিয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত ও ভজন-রহস্য-সমূহ শিক্ষা দিয়াছেন। ঠাকুরের ভাষায় এই নামহট্টের বিবরণ পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। ইহাতে তাঁহার নামহট্টের আদর্শ ও শিক্ষার উদ্দেশ্য পাঠকগণ পাইতে পারিবেন।

১। "শ্রীমহাপ্রভু কলিজীবের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ঘরে ঘরে নাম প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন ; অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই গোদ্রুমস্থ নামহাটের মূল মহাজন। নামহট্টের সমস্ত কর্ম্মচারীই আজ্ঞা-টহলের অধিকারী হইলেও টহলদার পদাতিক মহাশয়গণই এই কার্য্য বিশেষরূপে নিঃস্বার্থভাবে করিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও পদাতিক হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বাগ্রে নিজে নিজে ঐ কার্য্য করিয়া উক্ত পদের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। পয়সা ও চাউল ইত্যাদির আশায় যে 'টহল' দেওয়া যায়, তাহা শুদ্ধ আজ্ঞা-টহল নয়।

টহলদার মহাশয় করতাল বাজাইয়া বলিবেন—

হে শ্রদ্ধাবান্ জন! আমি আপনার নিকট কোন পার্থিব বস্তু বা উপকার চাহি না। আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে, আপনি প্রভুর আজ্ঞা পালন করতঃ কৃষ্ণনাম করুন, কৃষ্ণভজন করুন ও কৃষ্ণশিক্ষা করুন। কৃষ্ণনাম করুন অর্থাৎ নামাভাস ছাড়িয়া চিন্ময় নাম করুন। নামাভাস দুই প্রকার অর্থাৎ ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব নামাভাস। ছায়া-নামাভাস সহজেই ক্রমশঃ সর্ব্বার্থ-সাধক নাম হয়, যেহেতু তাহাতে একটু অজ্ঞানতম থাকিলেও ভক্তি-প্রতিকূল ভোগ-মোক্ষ-বাসনা-গন্ধ থাকে না। তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকেরা প্রথমে ঐ প্রকার নামাভাস করিতে করিতে সাধুসঙ্গ-বলে নামরসে অভিজ্ঞ হইয়া শুদ্ধনামগানে সক্ষম হন। তাঁহারাও ধন্য। ভুক্তি-মুক্তি-ফলকামীদিগের মধ্যেই প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহারা সেই সেই ক্ষুদ্র অভীষ্ট অনায়াসে নামের নিকট লাভ করে বটে, কিন্তু শুদ্ধনামচিন্তামণি লাভ করিতে পারে না; কেননা, ভোগ-মোক্ষ-সম্বন্ধীয় ভক্তি-প্রতিকূল-বাসনা তাহাদিগকে সহজে ছাড়ে না। বিশেষ ভাগ্যোদয়ে ভক্ত বা ভগবৎকৃপা-দ্বারা অকৈতব হৃদয় হইলে ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারাও শুদ্ধনামের আশ্রয় পান, কিন্তু তাহা অত্যন্ত বিরল। হে শ্রদ্ধাবান্ জন! নামাভাস ত্যাগ-পূর্ব্বক শুদ্ধনাম গান করাই জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণভজন কর। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন-দ্বারা অধিকার-ভেদে বিধিমার্গে বা রাগমার্গে ভজন

কর। যদি বিধিমার্গে রুচি থাকে, তবে তদুচিত শ্রীগুরুচরণে ভজনতত্ত্ব শিক্ষা করতঃ জীবের নিখিল অনর্থ-নিবৃত্তি-পূর্ব্বক কৃষ্ণা-লোচন কর। যদি রাগমার্গে লোভ হইয়া থাকে, তবে কোন ব্রজবাসী বা ব্রজবাসিনীর অনুরাগ-চরিত্র অনুকরণ-পূর্ব্বক যথারুচি ব্রজরস ভজন কর। ব্রজরস-ভজনে প্রবৃত্ত হইলে তদুচিত গুরু-কৃপায় ব্রজে নিত্য-স্থিতি ও যোগ্য চিন্ময়-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিবে।

অপরাধ দশটী—(১) বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও বৈষ্ণব-নিন্দা। (২) শিবাদি অন্য দেবতাকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ ঈশ্বর-জ্ঞান। সেই সেই দেবতাকে কৃষ্ণ-বিভূতি বা কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিলে আর ভেদ-জ্ঞান বা অনেক ঈশ্বর-জ্ঞান-জনিত দোষ হয় না। (৩) গুরুকে অবজ্ঞা। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুভেদে গুরু দ্বিবিধ। গুরুবাক্য বিশ্বাস করিবে ও গুরুকে কৃষ্ণের প্রকাশ-বিশেষ বা তাঁহার নিত্যপ্রেষ্ঠ শুদ্ধতত্ত্ব বলিয়া জানিবে। (৪) শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দা। শ্রুতিশাস্ত্র, বেদ, তদনুগ পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র, তৎসিদ্ধান্তরূপ ভগবদ্গীতা-শাস্ত্র, তৎ-মীমাংসা-দর্শনরূপ ব্রহ্মসূত্র ও তাঁহার ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত, তদ্বিস্তাররূপ ইতিহাস ও সাত্বত-তন্ত্রসকল এবং তত্তৎশাস্ত্র-সমূহের বিশদ-ব্যাখ্যা-স্বরূপ মহাজনকৃত ভক্তিশাস্ত্র-সমূহ। এই সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। (৫) হরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ শাস্ত্র-লিখিত নাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিমাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করা। (৬) নামের বলে পাপাচরণ। শ্রদ্ধায় নাম করিলে পূর্ব্ব-পাপ-সমূহ অনায়াসে বিনষ্ট হয়, আর পাপ করিতে রুচি হয় না। যদি নামের ভরসায়

পাপ করিতে স্পৃহা হয়, সেইটী নামাপরাধ। (৭) ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ প্রভৃতি শুভকর্ম্মের সহিত নামকে সমান বলিয়া যিনি নামের নিকট ভোগ-মোক্ষ-রূপ ফলের আশা করেন, তিনি নামাপরাধী। (৮) অশ্রদ্ধাবান্, বিমুখ ও শুনিতে ইচ্ছা করেন না,—এরূপ ব্যক্তিকে হরিনাম দেওয়া অপরাধ। যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মে নাই, তাঁহাকে হরিনাম উপদেশ করিবে না। কেবল হরিনামে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবার জন্য নাম-মাহাত্ম্য বলিবে। (৯) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে অবিশ্বাস ও অরুচি। (১০) অহংতা-মমতাপূর্ণ ব্যক্তির হরিনাম-গ্রহণে অপরাধ হয়। জড়শরীরে আত্মবুদ্ধি-ক্রমে যিনি শরীরগত অভিমান করেন ও জড়-সম্পত্তিতে স্বকীয় বুদ্ধি করিয়া আসক্ত হন, তাঁহার হরিনামাপরাধ স্বভাবতঃ আছে। যেহেতু, তিনি সাধ্য-সাধনের চিন্ময়ত্ব-জ্ঞান হইতে নিতান্ত বঞ্চিত। হে শ্রদ্ধাবান্ জন! এই দশাপরাধশূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণই জীবের মাতা, পিতা, সন্তান, দ্রবিণাদি, ধন ও পতি বা প্রাণেশ্বর। জীব—চিৎকণ, কৃষ্ণ—চিৎসূর্য্য ও জড়জগৎ—জীবের কারাগার। জড়াতীত কৃষ্ণলীলাই তোমার প্রাপ্যধন।

হে শ্রদ্ধাবান্ জীব, তুমি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়িক সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা তোমার যোগ্য নয়। যে-কাল-পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষজনিত কর্ম্মচক্র তোমাকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, সে-পর্য্যন্ত একটি সদুপায় অবলম্বন কর। প্রবৃত্তি-ক্রমে তুমি গৃহী, ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থ হও, অথবা নিবৃত্তিক্রমে তুমি

সন্ন্যাসী হও, সেই সেই অবস্থায় অনাচার ছাড়িয়া দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণের সংসারে বাহ্যেন্দ্রিয়গণ ও মনকে কৃষ্ণভাব-মিশ্রিত-বিষয়ে বিচরণ করাইয়া বহির্ম্মুখতা-শূন্য-হৃদয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। কৃষ্ণসেবানুকূল্য-রূপ পরমামৃত ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া তোমার স্থূল-লিঙ্গদেহদ্বয় ভঙ্গ করতঃ তোমার নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপকে পুনরুদিত করিবে। চৌর্য্য, মিথ্যাভাষণ, কাপট্য, বিরোধ, লাম্পট্য, জীব-হিংসা কুটিনাটী প্রভৃতি নিজের ও সমাজের অহিতকর কার্য্য—সমস্তই অনাচার। সে-সমস্ত ছাড়িয়া সদুপায়ের দ্বারা কৃষ্ণ-সংসার কর। সার কথা এই যে, সর্ব্বজীবে দয়া-পূর্ব্বক শুদ্ধ চরিত্রের সহিত তুমি কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। নাম-কৃপায় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় কৃষ্ণ তোমার সিদ্ধস্বরূপগত নয়নের গোচরীভূত হইবেন। অল্পদিনের মধ্যেই তোমার চিৎস্বরূপ উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে ভাসিতে থাকিবে।"

"বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালা"র চতুর্থ "গুটী"তে "নামতত্ত্ব শিক্ষাষ্টক"-শীর্ষক নিবন্ধে শিক্ষাষ্টকের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত গীতি প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার উপসংহারে নৃত্য-গীত সমাপ্তিকালে ভক্তিবিনোদ এইরূপ জয়ধ্বনি করিবার বিধি-প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—

"জয় শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র গোরাচাঁদ কি জয়!
জয় প্রেমদাতা শ্রীনিত্যানন্দ কি জয়!
জয় শ্রীশান্তিপুর-নাথ কি জয়!
জয় শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী কি জয়!

জয় শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ কি জয়!
জয় শ্রীনবদ্বীপধাম কি জয়!
জয় শ্রীনামহট্ট কি জয়!
জয় শ্রীশ্রোতাবর্গ কি জয়!"

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালার ষষ্ঠ গুটীতে "নাম-প্রচার" শীর্ষক নিবন্ধে "আজ্ঞা-টহল" অনুচ্ছেদে শ্রদ্ধাবান্ জন-সাধারণের নিকট নাম-হট্টের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে নগর-কীর্ত্তনের কয়েকটী গীতি—যাহা পরে ভক্তিবিনোদের 'গীতাবলী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাও প্রকাশিত হইয়াছে। উপসংহারে ভক্তিবিনোদ এইরূপ প্রেমধ্বনির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—

"প্রেমসে কহ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাস পণ্ডিত কি জয়! শ্রীঅন্তর্দ্বীপ মায়াপুর, সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম, রুদ্রদ্বীপাত্মক শ্রীনবদ্বীপ-ধাম কি জয়! শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গোপ-গোপী-গো-গোবর্দ্ধন-বৃন্দাবন-রাধাকুণ্ড-যমুনাজী কি জয়! শ্রীতুলসী দেবী কি জয়! শ্রীগঙ্গাজী কি জয়! শ্রীসুরভিকুঞ্জ কি জয়! শ্রীনামহট্ট কি জয়! শ্রীভক্তিদেবী কি জয়! শ্রীগায়ক-শ্রোতা ভক্তবৃন্দ কি জয়!"

সিদ্ধান্তমালার পঞ্চম গুটীর প্রারম্ভে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নাম-হট্টের গীতি গান করিবার প্রস্তাবনারূপে এইরূপ বলিতেছেন—

"শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

ভাই হে! অনন্ত-কল্যাণ-গুণ-রত্নাকর চিদচিদ্বিশিষ্ট-পরম-মহেশ্বর পরব্রহ্ম পরমাত্মবতারী সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হরি অপার সংসার-

সাগরে পতিত চিদ্বর্গের কল্যাণ-বিস্তার-বরণাভিপ্রায়ে সর্ব্বাদৌ বেদস্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরে সেই নিখিল শ্রুতির তাৎপর্য্য বিজ্ঞাপনার্থ নারায়ণ-নারদ-কপিল-ব্যাসাদি ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিখিল স্মৃতিশাস্ত্র প্রচার করেন। পুনশ্চ স্বীয় অচিন্ত্য-লীলা-প্রচারকরণাভিপ্রায়ে তিনি নৃহরি-বামন-রাম-কৃষ্ণ-স্বরূপে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হন। কিন্তু ক্রমশঃ দুস্তর কলিকালরূপ-মেঘাচ্ছন্ন হইলে জীবের চিত্তাকাশ অত্যন্ত কলুষিত হইল। তখন পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীনবদ্বীপ-ধামে শ্রীচৈতন্যচন্দ্ররূপে উদয় হইয়া জীবনিচয়ের নিত্যকল্যাণ-সাধনার্থ সর্ব্ববেদসার স্বীয় নামামৃত বর্ষণ করত কলিপীড়িত জীবের সমস্ত অবিদ্যা-ক্লেশ দূর করিলেন। সেই সচ্চিদানন্দ শচীতনয় স্বীয় শ্রীমুখ-গলিত পরম পীযূষ-স্বরূপ শিক্ষাষ্টক জগজ্জীবকে বিতরণ করেন। সেই শিক্ষাষ্টক অদ্য আমরা গান করিয়া পরম আনন্দ লাভ করি।"

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালার পঞ্চম গুটীতে "নাম-মহিমা" শীর্ষক নিবন্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরূপের নামাষ্টকের গীতানুবাদ ও গদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐসকল গানের প্রত্যেকটীতে রাগিণী ও তালের সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পঞ্চম গুটীতেই নিম্নলিখিত দালালের গীতটী প্রচারিত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুমদ্বীপের সুরভিকুঞ্জে যে নামের হাট খুলিয়াছেন, তাহাই দালাল অর্থাৎ প্রচারক শ্রদ্ধাবান্ জনসাধারণের নিকট ঘোষণা করিতেছেন। জীবকে হরিভজন করাইলে নিত্যানন্দের যে কৃপা লাভ হয়, তাহাই দালালের "দস্তুরি"।

"বড় সুখের খবর গাই।
সুরভি-কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ-নিতাই॥
বড় মজার কথা তায়।
শ্রদ্ধা-মূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায়॥
যত ভক্তবৃন্দ বসি'।
অধিকারী দেখে' নাম বেচ্‌ছে দর কষি'॥
যদি নাম কিন্‌বে ভাই।
আমার সঙ্গে চল মহাজনের কাছে যাই॥
তুমি কিন্‌বে কৃষ্ণনাম।
দস্তুরি লইব আমি, পূর্ণ হ'বে কাম॥
বড় দয়াল নিত্যানন্দ।
শ্রদ্ধা-মাত্র ল'য়ে দেন পরম-আনন্দ॥
একবার দেখ্‌লে চক্ষে জল।
গৌর-বলে নিতাই দেন সকল সম্বল॥
দেন শুদ্ধ কৃষ্ণশিক্ষা।
জাতি, ধন, বিদ্যাবল না করে অপেক্ষা॥
অমনি ছাড়ে মায়াজাল।
গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল॥
আর নাইকো কলির ভয়।
আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময়॥
ভক্তিবিনোদ ডাকি' কয়।
নিতাইচাঁদের চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয়॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যেরূপ জনসাধারণের জন্য নামহট্ট পাতিয়াছিলেন, তদ্রূপ নিখিল বৈষ্ণবের জন্য শ্রীসনাতন-রূপের শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পুনরুদ্বোধন করিয়াছিলেন। ১২৯২ সালের ৩০শে বৈশাখ কলিকাতা নগরীতে এই বিশ্ববৈষ্ণবসভার পুনঃ সংস্থাপন হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই বিশ্ববৈষ্ণবসভার সম্পাদক হইয়াছিলেন। সভার বিবরণ "বিশ্ববৈষ্ণবসভা কল্পাটবী" গ্রন্থ-মালায় প্রকাশিত হইত। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহ শ্রদ্ধাবান্ জন-সাধারণ ও বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচার করিয়া তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবার উদ্দেশ্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে কত উপায়ে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঠাকুরের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালার গুটীকা-সাহিত্য শ্রদ্ধাবান্ জনসাধারণের প্রতি এক অভূতপূর্ব্ব অবদান। mass বা জন-সাধারণকে তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ নিত্যধর্ম্মে আকৃষ্ট করিবার জন্য—শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের দ্বারা অমর করিবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নামহট্টের গীতি-সাহিত্য প্রকট করিয়াছিলেন। ভক্তিবিনোদ তাঁহার নামহট্টের বিভিন্ন সেবার জন্য বিভিন্ন পদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎসম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পাঠে জানা যায়, বৰ্দ্ধমান আমলাজোড়া নিবাসী ক্ষেত্রনাথ ভক্তিনিধি ও বিপিনবিহারী ভক্তিরত্ন মহাশয় যথাক্রমে নামহট্টের "দণ্ডীদার" ও "বিপণিপতি" ছিলেন। কেহ বা নামহট্টের 'ব্রাজকবিপণি,' কেহ বা 'জমাদার' কেহ বা 'সহরৎকারী' প্রভৃতি পদবী লাভ করিয়াছিলেন। আর স্বয়ং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নামহট্টের পরিমার্জ্জকরূপে জীবের

যে-সকল অপরাধ-অনর্থ-আবর্জ্জনারাশি তাঁহাদিগের নামহট্টে প্রবেশে বাধা প্রদান করিতেছে, তাহার পরিমার্জ্জন-সেবা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এত বড় দয়ালু ও এত বড় জীবদুঃখ-কাতর আর কি কেহ কোথাও হইয়াছেন? একদিন বাসুদেব দত্ত ঠাকুর মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রার্থনা নাম-হট্টের পরিমার্জ্জকাভিনয়ে বাস্তবতায় পরিণত করিয়াছেন। নাম-প্রভুর মন্দিরে অনর্থযুক্ত জীব আমরা যেন কোনপ্রকার অপরাধ-আবর্জ্জনারাশি নিক্ষেপ (?) করিতে না পারি, তজ্জন্য ভক্তিবিনোদ তাঁহার হস্তে একখানি শতমুখী লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এইজন্য সেই ভক্তিবিনোদাভিন্নবিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদারপরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃত-লীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ-মার্জ্জন-সেবার উপকরণরূপ-শতমুখীসূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্গানুকরণ-বর্জ্জন-কার্য্য জগতে অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।"

('গৌড়ীয়-কণ্ঠহার'-ভূমিকা)

গীতাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রত্যেকটি গীতি-সাহিত্য-গ্রন্থের এক একটী বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব আছে। 'শরণাগতি'তে প্রধান-ভাবে আত্মনিবেদন-শিক্ষা, 'কল্যাণকল্পতরু'তে প্রধানভাবে অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে নিঃশ্রেয়সের উপদেশ, 'গীতমালা'য় প্রধানভাবে শান্ত-দাস্য-ভক্তি ও রূপানুগ উজ্জ্বল-ভক্তি-শিক্ষা, আর 'গীতাবলী'তে অর্চ্চন ও ভজনপর উভয়বিধ সাধকের দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় ও অনুশীলনীয় যাবতীয় কৃত্যের উপদেশ প্রকাশিত হইয়াছে। গীতাবলীর অরুণোদয়-কীর্ত্তনে অতি প্রত্যুষ হইতেই হরিকীর্ত্তনে ও হরিস্মরণে জীবন-যাপনের প্রেরণা পাওয়া যায়। নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অরুণোদয়-কীর্ত্তন আমাদের কর্ণে এই উপদেশামৃত ঢালিয়া দিতেছেন—

"মুকুন্দ, মাধব, যাদব, হরি,
বলরে বলরে বদন ভরি',
মিছে নিদ-বশে গেলরে রাতি,
দিবস শরীর সাজে।"

রাত্রে নিদ্রাভিভূত ও জন্ম-জন্মান্তর মোহনিদ্রাগ্রস্ত জীবকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জাগ্রত করিয়া দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যুষেই মুকুন্দ-মাধব-নাম-কীর্ত্তনের উপদেশ-প্রদান-পূর্ব্বক তৎসঙ্গে শরীর-সজ্জা অর্থাৎ দেহাত্মহংবুদ্ধিরূপ নামাপরাধ পরিত্যাগের উপদেশ প্রদান এবং এই মনুষ্যদেহের দুর্ল্লভত্ব ও মনুষ্য-জীবনের চরম কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়াছেন—

"এমন দুর্ল্লভ মানব-দেহ,
পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ,
এবে না ভজিলে যশোদা-সুত
চরমে পড়িবে লাজে।"

মানুষ বর্ত্তমানের মোহে এবং মদে মুগ্ধ ও মত্ত হইয়া অন্তিমের কথা ভাবেন না। তাই পরদুঃখদুঃখী ভক্তিবিনোদ জীবনের অরুণোদয়-কালেই অন্তিমের জন্য ভাবিবার প্ররোচনা দিয়াছেন—

"উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হই'
না ভজ হৃদয়-রাজে।
জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি'
থাকহ আপন কাজে।"

গৌর-জন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সরল শিক্ষা এই যে, মনুষ্য-জীবনের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বা স্বভাব ইহাই হওয়া উচিত যে, জীব চেতন-বৃত্তিতে যত্নের সহিত নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হরি-ভজনের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। নাম-প্রভুর সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন-পূর্ব্বক "আপন কাজ" অর্থাৎ "স্বরূপের কার্য্য"রূপ নামানুশীলন বা ভক্তি-যাজনই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য।

৭—

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গীতাবলীর দ্বিতীয় গানে সেই শ্রুতির "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" মন্ত্রের সুমধুর পুনরাবৃত্তি করিয়া যেন মায়া-পিশাচীর কোলে অনাদিকাল যাবৎ মোহনিদ্রা-গ্রস্ত ও স্বরূপ-বিভ্রান্ত-জীবকে চেতন করিবার জন্য বলিতেছেন—

"জীব জাগ জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে ॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে ॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার গীতাবলীতে শ্রীগৌরগোবিন্দ, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের ত্রিসন্ধ্যারাত্রিক ও ভোগারাত্রিক প্রভৃতি বর্ণন করিয়াছেন। আরতি—অর্চ্চনের একটী বিশিষ্ট অঙ্গ। কীর্ত্তনমুখে সেই অঙ্গের অনুশীলন হইলেই তাহা সুষ্ঠু হয়। এইজন্য পূর্ব্ব মহাজন ও পদকর্ত্তৃগণ এই সকল আরতি-কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে বা বিভিন্ন মন্দিরাদিতে যে-সকল আরতি-কীর্ত্তন 'মহাজনের পদ' বলিয়া প্রচারিত রহিয়াছে, তাহাতে কএক শতাব্দীর নানাপ্রকার ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ চিন্তা-স্রোতের আবর্জ্জনার ন্যূনাধিক সংমিশ্রণ ও সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন মহাজনের ভনিতা বা পুষ্পিকার দোহাই দিয়া অনেক সম্ভোগবাদীর ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস-দুষ্ট চিন্তাস্রোতঃ কীর্ত্তনাদির মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এজন্য প্রাচীন পদাবলী সাহিত্যের মধ্য হইতে সাধারণ লোক প্রকৃত মহাজনের পদ চয়ন

করিয়া লইতে পারেন না। বৈষ্ণব-সমাজের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শুদ্ধ ভজনের নির্ম্মলতা সংরক্ষণের জন্য ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সম্মত ও গৌর-বিহিত গান-সমূহ রচনা করিয়াছেন। ভক্তি-বিনোদের রচিত আরতি-গান-সমূহ শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তে স্ববলিত।

ভক্তিবিনোদ প্রতি-কার্য্য, প্রতি-পদবিক্ষেপ যাহাতে কৃষ্ণসেবার অনুকূল হয়—তদ্দ্বারা যাহাতে নিষ্কপটভাবে অহৈতুকী কৃষ্ণসেবা সিদ্ধ হয়, সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। প্রসাদ-সেবন-কালে প্রসাদকে যাহাতে 'ভোগ্যবস্তু' বিচার না করিয়া কৃষ্ণ-সম্বন্ধি 'সেব্য-বস্তু' বলিয়া উপলব্ধ হয়; প্রসাদে যাহাতে 'তদীয় বিচার' বা ভগবানের কৃপাবতার বিচার করিয়া তাঁহার সম্মানের জন্য চিত্ত-বৃত্তি পরিনিষ্ঠিত থাকে; প্রসাদ-সেবন-কালে 'হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অধরামৃত পান করিতেছি'—এইরূপ সেবোন্মুখ-বুদ্ধিযুক্ত থাকিয়া যাহাতে আমরা মায়া-নির্ম্মুক্ত ও কৃষ্ণ-স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হইতে পারি; আমরা নিজেদের দেহেন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশ্যমূলে Vitamin A. B, C, D, E বা F খাদ্য যেন ভোগ বা ত্যাগ না করি, 'ভগবৎপ্রসাদ আমাদের বহির্ম্মুখ রুচির ইন্ধন বা উপকরণ'—এই বিচারের পরিবর্ত্তে যাহাতে 'কোন্ কোন্ বিচিত্রতা ভক্ত ও ভগবানের প্রিয় এবং তাঁহাদের প্রীতিতেই আমাদের প্রীতি'—এই স্মৃতি ও বিচার লইয়া প্রসাদ সেবা করিতে পারি, তজ্জন্য ভক্তিবিনোদ প্রসাদ-সেবন-কালেও হরি-কীর্ত্তন-মুখে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিতে বলিয়াছেন। 'প্রসাদ' অর্থে ভগবান্ বা বৈষ্ণবের কৃপা। কৃপা ভোগ্য বা ত্যজ্য বস্তু নহে, তাহা নিত্য-সেব্য—

"শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্ম্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে ॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিল ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই ॥

* * *

একদিন শান্তিপুরে, প্রভু অদ্বৈতের ঘরে,
দুই প্রভু ভোজনে বসিল।
শাক করি' আস্বাদন, প্রভু বলে ভক্তগণ,
এই শাক কৃষ্ণ আস্বাদিল ॥
হেন শাক আস্বাদনে, কৃষ্ণপ্রেম আইসে মনে,
সেই প্রেমে কর আস্বাদন।
জড়বুদ্ধি পরিহরি, প্রসাদ ভোজন করি',
হরি হরি বল সর্ব্বজন ॥"

প্রত্যেক কার্য্যে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-স্মরণ ও নিজেকে সেই অপ্রতিহত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞের ইন্ধন বা উপকরণ বলিয়া উপলব্ধি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্ম্মকথা। প্রসাদ-সেবনকালেও কৃষ্ণলীলার উদ্দীপনই কৃষ্ণভজনের অনুকূল। এইজন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গীতাবলীতে

প্রসাদ-সেবনকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলা, নীলাচল-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলাদি বর্ণন করিয়াছেন। শচীর অঙ্গনে মাধবেন্দ্র-পুরী কখনও কখনও সন্ন্যাসিগণের সহিত অতিথিরূপে আগমন করিয়া শচী-মাতার হস্ত-পাচিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি হরির ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিতেন ও কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইতেন। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের ঘরে বিচিত্র-নৈবেদ্য-সম্ভার আস্বাদন করিতেন। নীলাচলে শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণ শিব-বিরিঞ্চি-পূজিত মহাপ্রসাদ সম্মানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। কৃষ্ণ-লীলায় যশোদা-রোহিণী রামকৃষ্ণ গোচারণে দূরে যাইবেন জানিয়া নানাপ্রকার ভোজ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দিতেন। বয়স্য রাখালগণ কৃষ্ণের সহিত সেই সকল দ্রব্য আস্বাদন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। এই সকল লীলা কীর্ত্তনমুখে স্মরণ করিতে করিতে মহাপ্রসাদ সম্মান করিবার আদর্শ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ তাঁহার "গীতাবলী"তে শিক্ষা দিয়াছেন।

গীতাবলীতে **নগর-কীর্ত্তনের** আটটী সঙ্গীত আছে। তন্মধ্যে নামহট্টের ঘোষণাসূচক সঙ্গীতটী সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগর-কীর্ত্তনও শ্রদ্ধাবন্ত জনসাধারণ বা mass কে হরিসেবায় জাগরূক করিবার একটী বিশিষ্ট উপায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। তদনুসরণে তদনুগ জনগণ মোহনিদ্রাভিভূত জন-সাধারণকে জাগাইবার জন্য নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে খোল-করতালসহ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ভ্রমণ করেন। নগর-কীর্ত্তনের কতক-গুলি সঙ্গীত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গীতাবলীতে গুম্ফিত করিয়াছেন।

"কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম,—সর্ব্বধর্ম্মসার ॥"

—এই পদটী নগর-কীর্ত্তনের প্রথম গীতের শেষ দুই চরণ। নগর-কীর্ত্তনের দ্বিতীয় সঙ্গীত—

"গায় গোরা মধুর স্বরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

ইত্যাদি। এই কীর্ত্তনের উপসংহারে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবকে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—

"এখনও চেতন পেয়ে,
রাধামাধব নাম বলরে ॥
জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ,
ভক্তিবিনোদোপদেশ,
একবার নামরসে মাতরে ॥"

গীতাবলীর তৃতীয় সঙ্গীতটি আশার কুহকে মত্ত জীবকুলের মোহমুদ্গর-স্বরূপ। ইহাতে দেহাদিতে প্রযত্ন, অহংতা-মমতা, জয়-পরাজয়, ক্রোধ-হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গৌর-পদাশ্রয় করিয়া রাধাকৃষ্ণ-নামগানে চিদানন্দরসময় হইবার করুণ আবেদন রহিয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কোন গানেই সম্বন্ধ-জ্ঞানোপদেশের অভাব নাই,—ইহাই তাঁহার গীতাবলীর বৈশিষ্ট্য। গীতাবলীর নগর-সঙ্কীর্ত্তনের চতুর্থ সঙ্গীতটি বহুল প্রচারিত হইয়াছে—

"রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ বলরে সবাই।
(এই) শিক্ষা দিয়া, সব নদীয়া,
ফির্‌ছে নেচে গৌর-নিতাই॥" ইত্যাদি।

এখানেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্বন্ধজ্ঞানোপদেশে কোন-প্রকার কার্পণ্য নাই—

(মিছে) "মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই।
(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
কর্‌লে ত' আর দুঃখ নাই॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই নগর-কীর্ত্তনটী করিতে করিতে সকলের নিকট একটী ভিক্ষা চাহিয়া ফেলিয়াছেন—

(রাধা) "কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই।"

নগরে ও গ্রামে গৃহিগণ গৃহ বাঁধিয়া বাস করেন। অবধূত-বেশী নিত্যানন্দের বাতুল ভক্তিবিনোদ সকলকে তাঁহার সঙ্গে চলিবার জন্য অর্থাৎ রূপানুগ হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। 'রাধাকৃষ্ণ বলিতে বলিতে আমার অনুসরণ কর অর্থাৎ তোমরাও হরি-কীর্ত্তনের প্রচারক হও'—ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা—

"যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ॥"

নগর-সংকীর্ত্তনের পঞ্চম সঙ্গীতে—জীবের জন্য গোরাচাঁদ উচ্চৈঃস্বরে যে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন, সকলকে উচ্চৈঃস্বরে সেই নামের অনুকীর্ত্তন করিবার জন্যই ভক্তিবিনোদ আহ্বান করিয়াছেন এবং বৎসল ও মধুর রসের বিষয়-বিগ্রহ যশোদা-জীবন ও গোপীপ্রাণধনের নাম-কীর্ত্তন করিবার উপদেশ করিতেছেন। সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা করিতে গেলে অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি অনর্থের প্রতীক-সমূহ উপস্থিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণ অসুরকুলকে বিনাশ ও ব্রহ্মার বিমোহন করিয়া ব্রজবাসিগণের উপকার করিয়া থাকেন। এই গীতে ভক্তিবিনোদ এই আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন।

ষষ্ঠ সঙ্গীতে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়া-নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে যে—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

নাম-কীর্ত্তন করিতেন, সেই লীলাই নগর-কীর্ত্তনরূপে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ণন করিয়াছেন।

সপ্তম সঙ্গীতে নিতাইচাঁদ গোলোক হইতে যে নামচিন্তামণি আনয়ন করিয়া নামের হাটে শ্রদ্ধা-মূল্যে বিতরণ করিতেছেন, সেই লীলা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এখানেও ভক্তিবিনোদ নামাভাস ও শুদ্ধনামের বিচার প্রদর্শন করিয়া তাঁহার স্বভাব-সুলভ মহাবদান্যতা ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

নগর-কীর্ত্তনের অষ্টম সঙ্গীত বা শেষ সঙ্গীতটী সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ—

"হরি ব'লে মোদের গৌর এলো।
এলরে গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমে এলো-খেলো॥"

'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডের ২৪৪ পৃষ্ঠায় এই নগর-কীর্ত্তন-গীতিটীর শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে—"ধাম-পরিক্রমায় বৈষ্ণব-সকল আসিলে তদুদ্দেশ্যে গীত"।

গীতাবলীতে গীত বা কীর্ত্তনের নিম্নলিখিত বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়—

(১) অরুণোদয়-কীর্ত্তন, (২) আরতি-কীর্ত্তন, (৩) প্রসাদ-সেবা-কালীন কীর্ত্তন, (৪) শ্রীনগর-কীর্ত্তন, (৫) শ্রীনাম-কীর্ত্তন, (৬) শ্রেয়ো-নির্ণয়, (৭) শ্রীনামাষ্টক, (৮) শ্রীরাধাষ্টক, (৯) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শত-নাম-গান, (১০) কৃষ্ণের বিংশোত্তর শতনাম সংকীর্ত্তন ও (১১) শিক্ষাষ্টক-কীর্ত্তন।

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে পাঁচটী সঙ্গীত দেখিতে পাওয়া যায়। নাম-সংকীর্ত্তনের প্রথম সঙ্গীতে "যশোমতি-নন্দন, ব্রজবর নাগর, গোকুল-রঞ্জন কান" প্রভৃতি নাম-সমূহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিশেষ প্রিয় ও তদ্দ্বারা ভক্তিবিনোদের গৌরজনত্ব ও রূপানুগবরত্ব পরিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু যেমন তাঁহার নামাষ্টকের—

"অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয়॥"

শ্লোকে যশোদানন্দন ও গোপীচন্দ্র—এই নাম দুইটীর দ্বারা বাৎসল্য ও মধুর রসের বিষয়-বিগ্রহ যশোদা-নন্দন ও শ্যামসুন্দর এই দুইটী নামেই অধিক প্রীতি দেখাইয়াছেন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার নাম-কীর্ত্তনে যে-সকল নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা শ্রীরূপের ঐ চিত্তবৃত্তি ও রূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-কথিত শ্রীবল্লভ ভট্টের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিম্নলিখিত উক্তির অনুসরণ করিয়াছেন—

"প্রভু কহে,—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর' 'যশোদানন্দন,'—এই মাত্র জানি ॥"

কৃষ্ণনামের 'রূঢ়ি' অর্থ—

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণয়ঃ ॥

(চৈঃ চঃ অ ৭।৮১-৮২ ও কৃষ্ণসন্দর্ভে ধৃত শ্রীলক্ষ্মীধর-কৃত নামকৌমুদী-শ্লোক)

[তমাল-শ্যামলবর্ণ ও যশোদা-স্তনপায়ী,—এই দুইটী কৃষ্ণনামে সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণীত রূঢ়ি অর্থাৎ মুখ্য অর্থ বর্ত্তমান]

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নাম-কীর্ত্তনের মধ্যে 'অমল হরিনাম অমিয় বিলাসা' পদের দ্বারা নাম বিচিত্র-বিলাসময় ; নামেই রূপ, গুণ, পরিকর, লীলা—সমস্ত বিরাজিত আছেন,—ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। উপরি-উক্ত পদের অব্যবহিত পরেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতেছেন। যেমন, বিপিন-পুরন্দর, অসুরকুল-নাশন, নবনীত-তস্কর, গোপী-বসনহর, রাসরসিক প্রভৃতি নাম।

নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বিতীয় সঙ্গীত—

"দয়াল নিতাই-চৈতন্য ব'লে নাচ্‌রে আমার মন।"

একটী বিশেষ সিদ্ধান্তপূর্ণ সঙ্গীত। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের কৃপা ব্যতীত অনর্থ-অপরাধ, কৃষ্ণনামে রুচি ও ভব-বন্ধন দূর হইতে পারে না এবং বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের সেবাও লাভ হয় না। এই সঙ্গীতটিতে গৌর-জন ভক্তিবিনোদ গৌরবাদী ও কৃষ্ণবাদী উভয়ের মতবাদ নিরাস করিয়াছেন। গৌরবাদিগণ বলেন,—যখন গৌরই 'কৃষ্ণ' তখন গৌর-ভজনই কৃষ্ণ-ভজন, কৃষ্ণনাম-গ্রহণের আর প্রয়োজন নাই। আবার কৃষ্ণবাদিগণ বলেন,—এক কৃষ্ণের নামানুশীলনেই কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, গৌরসুন্দরের আশ্রয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। ঐ উভয় মতবাদই মায়া-মিশ্রিত ও রূপানুগ-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। নিতাই-গৌরের কৃপা হইলে কৃষ্ণনামে রুচি হয়, গৌরের কৃপা হইলে বৃন্দাবনে তাঁহাকেই রাধাশ্যামরূপে দর্শন হয়। রূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও তাঁহার প্রার্থনার প্রথম সঙ্গীতে নিতাই-চাঁদের করুণায় সংসার-বাসনা-নিবৃত্তি, বিষয় হইতে বিরতি, চিত্তশুদ্ধি ও শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে যোগ্যতা-লাভ, গৌরাঙ্গ-নামে পুলক হইলে কৃষ্ণনামে নয়নে প্রেমাশ্রু-উদয়, শ্রীরূপ-রঘুনাথের পাদপদ্মে আর্ত্তি হইলে যুগলপ্রেম বুঝিবার সামর্থ্যের কথা জানাইয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার নাম-কীর্ত্তনের প্রতি-ছত্রে সম্বন্ধ-জ্ঞান ও অপরাধশূন্য হইয়া নাম-কীর্ত্তন করিবার উপদেশ দিয়াছেন—

"হরি ব'লে দেও ভাই আশার মুখে ছাইরে।

(নিরাশ ত' সুখরে)

ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাইরে।
(শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়েরে)"

আবার গাহিয়াছেন—

"অসৎসঙ্গ ছাড়ি' ভাই বোল হরি বোল।
বৈষ্ণবের চরণে পড়ি', বোল হরি বোল ॥"

নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বশেষ-সঙ্গীতে গাহিয়াছেন—

"গুরুকৃপা-জলে নাশি' বিষয়-অনল।
রাধাগোবিন্দ বল (চার বার)
কৃষ্ণেতে অর্পিয়া দেহ-গেহাদি সকল।
রাধাগোবিন্দ বল (চার বার)
অনন্যভাবেতে চিত্ত করিয়া সরল।
রাধাগোবিন্দ বল (চার বার)
রূপানুগ-বৈষ্ণবের পিয়া পদজল।
রাধাগোবিন্দ বল (চার বার)
দশ-অপরাধ ত্যজি' ভুক্তি-মুক্তি-ফল।
রাধাগোবিন্দ বল (চার বার)
সখীর চরণরেণু করিয়া সম্বল।
রাধাগোবিন্দ বল (চার বার)
স্বরূপেতে ব্রজবাসে হইয়া শীতল।
রাধাগোবিন্দ বল (চার বার)"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এক একটী গীতিই এক একটী পরিপূর্ণ সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক-গ্রন্থ। তাঁহার গীতি-সাহিত্য

আলোচনা করিয়া মূর্খ ও পণ্ডিত সমভাবে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারেন, অন্য গ্রন্থ হইতে উপদেশ-সংগ্রহের আবশ্যকতা থাকে না।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার গীতাবলীর শ্রেয়োনির্ণয়-পরিচ্ছেদে কিরূপ সাধারণ যুক্তির দ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বিচার করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিভিন্ন মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের নানা কাণ্ড, নানা মত, নানা পথ বা 'যত মত তত পথে'র যে মূল্য নিঃশ্রেয়স লাভের পক্ষে খুবই কম, বরং প্রতি-বন্ধক বা উপাধি, তাহা অতীব দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন। ঠাকুর নরোত্তম—

"জ্ঞান, কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তা'র কথা নাহি শুনি, পরমার্থ-তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তজন-প্রাণ॥"

প্রভৃতি পদের মধ্যে যে-সকল কথা বিনা যুক্তিতে কীর্ত্তন করায় অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ ঠাকুর নরোত্তমকে "গোঁড়া একঘেয়ে" প্রভৃতি বলিয়া ঠাকুর মহাশয়ের চরণে অপরাধ করিয়াছে, ভক্তি-বিনোদ তাহাই সংক্ষিপ্ত, পরিমিত ও সারগর্ভ যুক্তির সহিত কীর্ত্তন করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসুর পরম মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। তিনি শ্রেয়োনির্ণয়ে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণভক্তি বিনা কভু নাহি ফলোদয়।
মিছে সব ধর্ম্মাধর্ম্ম জীবের উপাধিময়॥

যোগ-যাগ-তপো-ধ্যান সন্ন্যাসাদি ব্রহ্মজ্ঞান,
নানাকাণ্ডরূপে জীবের বন্ধন-কারণ হয় ॥
বিনোদের বাক্য ধর, নানাকাণ্ড ত্যাগ কর,
নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয়ে দেহ আশ্রয় ॥"
"আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব-মীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে র'বে তুমি চিরদিন ॥"

—শ্রেয়োনির্ণয়ের এই দ্বিতীয় সঙ্গীতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণ, জীব ও মায়ার স্বরূপ এবং কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ অতি প্রাণস্পর্শী ঝঙ্কারে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রেয়োনির্ণয়ের তৃতীয় সঙ্গীতে সচ্চিদানন্দে (কৃষ্ণে) প্রীতিকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একটি রূপবতী-নারীরূপে বর্ণন করিয়াছেন। দয়া, ধর্ম্ম প্রভৃতি গুণ সেই সতী রমণীর অঙ্গের ভূষণ; কৃষ্ণ-জ্ঞান তাহার পট্টশাড়ি, ভক্তিযোগ তাহার সুগন্ধ, প্রীতি সেই সকল ভূষণে ভূষিতা হইয়া কৃষ্ণের মন চুরি করিতেছে। ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন—রূপ ব্যতীত অলঙ্কারের যেরূপ কোন মূল্য নাই, কৃষ্ণপ্রীতি-বিহীন দয়া-ধর্ম্মাদি গুণেরও কিছুই মূল্য নাই, উহারা কৃষ্ণের সন্তোষ-বিধান করিতে পারে না। যেরূপ বানরীর অঙ্গের অলঙ্কার উহার শোভা-বর্দ্ধনের পরিবর্ত্তে উহাকে হাস্যোদ্দীপক করিয়া তুলে, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত দয়া-ধর্ম্মাদি-গুণকে ভক্তিবিনোদ কখনও আদর করেন না।

শ্রেয়োনির্ণয়ের চতুর্থ সঙ্গীতটি নিরাকারবাদি-সম্প্রদায়ের বিচার-খণ্ডনমূলে রচিত হইয়াছে—

"নিরাকার নিরাকার করিয়া চীৎকার।
কেন সাধকের শান্তি ভাঙ্গ ভাই বার বার ॥
তুমি যা' বুঝেছ ভাল, তাই ল'য়ে কাট কাল,
ভক্তি বিনা ফলোদয় তর্কে নাহি জান সার ॥"

শ্রেয়োনির্ণয়ের পঞ্চম সঙ্গীতটী ঠাকুরের 'প্রেমপ্রদীপ' উপন্যাসের চতুর্থ প্রভায় যোগী, বাবাজী প্রভৃতির মুখে ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করাইয়াছেন—

"কেন আর কর দ্বেষ, বিদেশী জন-ভজনে।
ভজনের লিঙ্গ নানা, নানাদেশে নানাজনে ॥
কেহ মুক্ত কচ্ছে ভজে, কেহ হাঁটু গাড়ি' পূজে,
কেহ বা নয়ন মুদি' থাকে ব্রহ্ম-আরাধনে ॥
কেহ যোগাসনে পূজে, কেহ সংকীর্ত্তনে মজে,
সকলে ভজিছে সেই একমাত্র কৃষ্ণধনে ॥
অতএব ভ্রাতৃভাবে থাক' সবে সুসদ্ভাবে,
হরিভক্তি সাধ সদা, এ জীবনে বা মরণে ॥"*

ঠাকুরের এই গানটী শুনিয়া অতাত্ত্বিক-লোকের ভ্রম হইতে পারে যে, ঠাকুর চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ বা 'যত মত তত পথে'র সমন্বয় করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহা শ্রীগীতার নিম্নলিখিত শ্লোক-সমূহের প্রতিধ্বনি—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥"

(গীতা ৯।২৩-২৪)

তথাকথিত সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচার এইরূপ—

"যদি সর্ব্বনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে জগতে আর অশ্রেষ্ঠ কে আছে? যে যাহাতে নিষ্ঠা করে, তাহাই ভাল। ভাল-মন্দের বিচার কি? মুড়ি-মিছরি একই হইয়া পড়ে। জীবের আর সাধন-ভজনের কিছুই প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে বেশ্যা-নিষ্ঠ লম্পট ও তৎসঙ্গ-নিস্পৃহ পরমহংস—এ দুইয়ের ভেদ কি? তাহা হইলে অতদ্ ও তদ্—দুই এক। অতএব সকল বিষয়ে নির-পেক্ষতাকে ভাল বলা যায় না, বরং সৎসাপেক্ষ হইয়া নিরপেক্ষতাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ সদ্বস্তু-নিষ্ঠাই শ্রেয়ঃ এবং অসৎনিষ্ঠাই দোষ। * * * প্রীতি-তত্ত্বের জীবনই নৈষ্ঠিকতা। ** পরমারাধ্যা ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে এতদূর মুগ্ধা যে, কৃষ্ণ স্বয়ং চতুর্ভুজ হইলে তাঁহারা নিরপেক্ষ-ভাব প্রকাশ করিলেন। * * *

আমরা করযোড়ে সমস্ত জগৎকে বলিতেছি,—হে ভ্রাতৃবর্গ, নিরপেক্ষতা বিষয়-সম্বন্ধেই থাকুক, ভগবৎ-সম্বন্ধে উহাকে চিত্ত হইতে দূর কর। ভগবানের নিত্য-লীলা অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিত্য-স্বরূপের সেবা লাভ কর। মায়িক লীলার মধ্যেও তাঁহার নিত্য-লীলার পরিচয় আছে। জড়ীয় সাকার-নিরাকার-বিবাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব-স্বরূপ সেই ভগবৎ-সৌন্দর্য্য

দর্শন কর। ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্ম হইতে অভেদ ও নিত্য। সাধনভক্তি-দ্বারা ভাবভক্তি ও তদ্দ্বারা নির্গুণ প্রেমভক্তি লাভ কর। ঈশ্বর-পরমাত্মাদি সাম্বন্ধিক স্বরূপ অতিক্রম করতঃ নিত্যস্বরূপ ভগবান্‌কে প্রীতিসূত্রে লাভ কর।" (সজ্জনতোষণী, ২য় খণ্ড, ১১১-১১৩ পৃষ্ঠা)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার উপরি-উক্ত গীতির বিবৃতি যেন 'কৃষ্ণসংহিতা'র উপক্রমণিকায় এইরূপভাবে প্রদান করিয়াছেন—

"সম্প্রদায়-লক্ষণটী প্রাচীনকাল হইতে সর্ব্বদেশে দৃষ্ট হয়। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে ইহা অত্যন্ত প্রবল। মধ্যমা-ধিকারীরাও কিয়দংশে ইহাকে বরণ করেন। উত্তমাধিকারিগণের সাম্প্রদায়িকতা নাই। লিঙ্গ-নিষ্ঠাই সম্প্রদায়ের প্রধান চিহ্ন। এই লিঙ্গ তিন প্রকার অর্থাৎ আলোচকগত, আলোচনাগত ও আলোচ্যগত। সাম্প্রদায়িক সাধকগণ কতকগুলি বাহ্য চিহ্ন স্বীকার করেন, তাহাই আলোচকগত লিঙ্গ;—মাল্য-তিলকাদি, গৈরিক-বস্ত্রাদি ও বিদেশীয়গণের মধ্যে ব্যাপটিসম্ সুন্নতাদি ইহার উদাহরণ। উপাসনা-কার্য্যে যে-সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণীত হয়, তাহাই আলোচনাগত লিঙ্গ;—যজ্ঞ, তপস্যা, হোম, ব্রত, স্বাধ্যায়, ইজ্যা, দেবমন্দির, বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ-নদ্যাদির বিশেষ বিশেষ পাবিত্র্য, মুক্তকচ্ছতা, আচার্য্যাভিমান, বদ্ধকচ্ছতা, চক্ষুনিমীলন, বিশেষ বিশেষ পুস্তকাদির সম্মাননা, আহারীয় বস্তু-সমুদায়ে বিধি-নিষেধ, বিশেষ বিশেষ দেশ-কালের পবিত্রতা ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। পরমেশ্বরের নিরাকার-সাকার-ভাবস্থাপন, ভগবদ্ভাবের নির্দ্দেশক-নিরূপণ অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদি স্থাপন, তাঁহার অবতার-চেষ্টা-প্রদর্শন

৮—

ও বিশ্বাস, স্বর্গ-নরকাদি কল্পনা, আত্মার ভাবী অবস্থা বর্ণন ইত্যাদি —আলোচ্যগত লিঙ্গের উদাহরণ। এই সকল পারমার্থিক-চেষ্টা-নির্গত লিঙ্গদ্বারা সম্প্রদায়-বিভাগ হইয়া উঠে। পরন্তু দেশভেদে, কালভেদে, ভাষাভেদে, ব্যবহারভেদে, আহারভেদে, পরিধেয়-বস্ত্রাদিভেদে ও স্বভাবভেদে যে-সকল ভিন্নতার উদয় হয়, তদ্দ্বারা জাত্যাদি ভেদ-লিঙ্গ-সকল পারমার্থিক লিঙ্গ-সকলের সহিত সংযোজিত হইয়া ক্রমশঃ একদল মনুষ্যকে অন্যদল হইতে এরূপ পৃথক্ করিয়া তুলে যে, তাহারা যে মানব-জাতিত্বে এক,—এরূপ বোধ হয় না। এবম্বিধ ভিন্নতা-বশতঃ ক্রমশঃ বাগ্‌বিতণ্ডা, পরস্পর আহারাদি পরিত্যাগ, যুদ্ধ ও প্রাণনাশ পর্য্যন্ত অপকার্য্য দৃষ্ট হয়। কনিষ্ঠাধিকারী অর্থাৎ কোমল-শ্রদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে ভারবাহিত্ব প্রবল হইলে এই শোচনীয় ঘটনা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। যদি সারগ্রাহী প্রবৃত্তি স্থান প্রাপ্ত হয়, তবে লিঙ্গাদি-জনিত বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত না হইয়া কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরা উচ্চাধিকার প্রাপ্তির যত্ন পাইয়া থাকেন। মধ্যমাধিকারীরা বাহ্য লিঙ্গ লইয়া ততদূর বিবাদ করেন না, কিন্তু জ্ঞানগত লিঙ্গাদি-দ্বারা তাঁহারা সর্ব্বদা আক্রান্ত থাকেন। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের লিঙ্গ-সকলের প্রতি সময়ে সময়ে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তর্কগত লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। আরাধ্য বস্তু নিরাকার,—এই তর্কগত আলোচ্য-নিষ্ঠ লিঙ্গ-স্থাপনার্থ তাঁহারা কনিষ্ঠাধিকারীদিগের প্রতিষ্ঠিত আলোচ্যগত-লিঙ্গ অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদির অপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। এস্থলে তাঁহাদের ভারবাহিত্বকেই কারণ বলিয়া লক্ষ্য

হয়। কেননা, যদি তাঁহাদের উচ্চাধিকার প্রাপ্তি-জন্য সারগ্রাহী চেষ্টা থাকিত, তাহা হইলে উভয় লিঙ্গের সাম্বন্ধিক সম্মাননা করিয়া লিঙ্গাতীত বস্তুর জিজ্ঞাসার উপলব্ধি করিতেন। বস্তুতঃ ভারবাহিত্ব-ক্রমেই লিঙ্গ-বিরোধ উপস্থিত হয়। সারগ্রাহী মহোদয়গণ অধিকারভেদে লিঙ্গভেদের আবশ্যকতা বিচার-পূর্ব্বক স্বভাবতঃ নির্বৈর এবং সাম্প্রদায়িক বিবাদ-সম্বন্ধে উদাসীন হন। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারীদিগের মধ্যে সারগ্রাহী ও ভারবাহী উভয়বিধ মনুষ্যই লক্ষিত হয়। ভারবাহী লোকেরা যে এই শাস্ত্র আদর করিয়া গ্রহণ করিবেন,—এরূপ আশা করা যায় না। লিঙ্গ-বিরোধ-বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অবলম্বন-পূর্ব্বক ক্রমোন্নতি-বিধির আদর করিলে কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারী —সকলেই সারগ্রাহী হইয়া থাকেন।"

শ্রেয়োনির্ণয়ের ষষ্ঠ সঙ্গীতে—"ভজরে ভজরে আমার মন অতি মন্দ"—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রূপানুগ-ভজনের মর্ম্মকথা প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত সঙ্গীতের উপসংহারে বলিয়াছেন যে, ভজনানন্দী রূপানুগ সাধুজনের আনুগত্য ব্যতীত কখনও ব্রজবাস সম্ভব নহে।

ষষ্ঠ সঙ্গীতে যেরূপ জীবের মন্দ মনকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ভজন ও স্মরণের দ্বারা ব্রজের পথে চালনা করিবার প্ররোচনা দিয়াছেন, তদ্রূপ সপ্তম সঙ্গীতে দুষ্ট মনকে বিষয়-বিষ, রিপুর মত্ততা, অসৎকথা, ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা, প্রতিষ্ঠাশা-কুটীনাটী-শঠতাদি বৃত্তি হইতে মুক্ত করিয়া সরল মনে, সাধুসঙ্গে বৈষ্ণব-চরণে রতিবিশিষ্ট হইতে

বলিয়াছেন। (বৈষ্ণব-চরণে রতি ও আসক্তি ব্যতীত দুষ্ট মন কিছুতেই দমিত হইতে পারে না।) Impo

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতাবলীর "শ্রীনামাষ্টক" শ্রীরূপের শ্রীনামাষ্টকের পদ্যানুবাদ; ইহা অনুবাদ হইলেও ইহাতে শ্রীরূপানুগ-বরের মৌলিকত্বের সহিত শ্রীরূপ-পদাঙ্কানুসরণ-বৃত্তিটী পরিস্ফুট হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সঙ্গীত-সাহিত্যের কোন্ কোন গীতিতে কোথায়ও মৈথিল, কোথায়ও বা ব্রজবুলি-মিশ্রিত পদ ব্যবহার করিয়াছেন। নামাষ্টকের প্রথম সঙ্গীতটীতে ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনামাষ্টকের প্রথম, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম গীতিতে শ্রীনাম ও শ্রীরূপের চরণে নামের স্ফুর্ত্তির জন্য প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন, যথা—

"নাম-চরণে প'ড়ে, ভক্তিবিনোদ কহে,
তুয়া পদে মাগহু নিলয়॥"
(প্রথমাষ্টক)

"রূপ-স্বরূপ-পদ, জানি' নিজ সম্পদ্,
ভক্তিবিনোদ ধরি' মাগে॥"
(পঞ্চমাষ্টক)

"ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপ-চরণে।
বাচক-স্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে॥"
(ষষ্ঠাষ্টক)

"ভক্তিবিনোদ রূপগোস্বামি-চরণে।
মাগয়ে সর্ব্বদা নামস্ফূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণে॥" (সপ্তমাষ্টক)

"শ্রীকৃষ্ণ-নাম, রসনে স্ফুরি',
পূরাও আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে, যাচয়ে ইহা,
ভকতিবিনোদ-দাস॥"
(অষ্টমাষ্টক)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বৎসল ও মধুর রসের বিষয়-বিগ্রহ যশোদা-নন্দন শ্যামসুন্দরই রূপানুগ-গণের আরাধ্য-বস্তু। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকেও 'অয়ি নন্দতনুজ,' 'গোবিন্দ,' 'লম্পট' প্রভৃতি নামের মধ্যে শ্রীযশোদাস্তনন্ধয় তমালশ্যামলত্বিট্ 'গোপীচন্দ্র'কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রীরূপের শ্রীনামাষ্টকেও 'যশোদা-নন্দন' 'নন্দসূনু,' 'কমলনয়ন' 'গোপীচন্দ্র,' 'বৃন্দাবনেন্দ্র' প্রভৃতি নামে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজভজনগত মধুর ও বৎসলরতির বিরোধী যে-সকল ভাব আছে, তাহা বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া নামাষ্টকে 'পূতনা-ঘাতন,' 'অঘ-বক-মর্দ্দন,' 'কালীয়-শাতন' প্রভৃতি নাম ভক্তিবিনোদ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরূপ-প্রভু 'প্রণত-করুণ'—এই নামটীতে ঔদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

গীতাবলীতে শ্রীরাধাষ্টকের আটটী সঙ্গীত রূপানুগ-মুক্তফুলের জীবনরক্ষৌষধি-স্বরূপ। শ্রীরাধাষ্টক কীর্ত্তন করিতে করিতেও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐকান্তিক-কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা ও দেহাত্ম-

বুদ্ধির মূলক প্রাকৃত-রসবিলাসরূপ দুঃসঙ্গের উপর তীব্র কষাঘাত পরিত্যাগ করেন নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রাধাষ্টকের প্রথমাষ্টকে উপসংহারে গাহিয়াছেন—

"ছোড়ত ধন-জন, কলত্র-সুত-মিত,
ছোড়ত করম গেয়ান।
রাধা-পদপঙ্কজ, মধুরত সেবন,
ভকতিবিনোদ পরমাণ॥"

শ্রীরাধা-পাদপদ্মের সেবক হইবার সুদুর্লভ পরতম সৌভাগ্য-বাঞ্ছার উদয় হইলে ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, জাগতিক মিত্র বা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্তি কর্ম্ম-জ্ঞানের ন্যায় দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে ত্যাগ করিতে হইবে। যেমন কর্ম্ম-জ্ঞান-বদ্ধ থাকা-কালে শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না, তদ্রূপ ধন-জন-পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্তি-থাকা-কালে কিছুতেই শ্রীরাধা-পাদপদ্মের সেবা পাওয়া যায় না। মহাভাগবতের গার্হস্থ্য-লীলা অনর্থযুক্ত জীবের ন্যায় নহে। তাঁহার 'ভজনময় গৃহেতে গোলোক ভায়'। কিন্তু সাধারণ বাহ্য-দৃষ্টিতে মহাভাগবতের গার্হস্থ্য-লীলাও তিনি শেষে রাখিতে চাহেন না। তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণের সংসার হইলেও, তাঁহার বিন্দুমাত্র জড়ভোগের সংসার না থাকিলেও তিনি চাহেন—অসঙ্গ হইয়া শ্রীরাধার সেবিকার আনুগত্যে অনুক্ষণ শ্রীরাধা-গোবিন্দের কৈঙ্কর্য্য। শ্রীল রায় রামানন্দ যেরূপ শেষে মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে বাহ্য-দৃষ্টিতে সংসার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদ্গত-ভাবের দোহার দিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর সঙ্গে অনুক্ষণ কৃষ্ণরসকথালাপ-প্রসঙ্গে প্রমত্ত

ছিলেন, সুবল যেরূপ কৃষ্ণের নিত্য-সঙ্গী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রাধা-পদপঙ্কজ-সেবকেরও সেইরূপ চিত্তবৃত্তির কথা বলিয়াছেন। গৃহ-দেহাসক্ত বা কর্ম্ম-জ্ঞানাসক্ত, ভোগ-ত্যাগাসক্ত, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় মুখে অনুকরণ করিয়া অনুক্ষণ 'রাধে', 'রাধে' বলিলেও শ্রীরাধার কোন সন্ধান পায় না। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভাষায় বলিতে গেলে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সম্মুখে অন্যাভিলাষের বাধাই নিত্য বিরাজিত থাকে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রাধা ও কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির গূঢ় রহস্য বলিতেছেন—

"রাধা-পদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে॥"

(প্রথমাষ্টক)

'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'তে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন—

"পাদাব্জয়োস্তব বিনা বর দাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥"

শ্রীরাধার অনুগত-জনের আনুগত্যে ও সঙ্গ-ফলেই কৃষ্ণভজন-রসের আস্বাদন হয়, নতুবা অসম্ভব। শ্রীরূপ-রঘুনাথের কৃপা ব্যতীত শ্রীরাধা-গোবিন্দের কৃপা ও সেবা-লাভ কখনই সম্ভব নহে। কেননা,

শ্রীরূপ-রঘুনাথ নিত্য শ্রীরাধা-জন। তাই ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীরাধাষ্টকের ভণিতায় শ্রীরূপ-রঘুনাথের কৃপা-প্রার্থনার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন—

"ভকতিবিনোদ, রূপ-রঘুনাথে,
কহয়ে চরণ ধ'রি।
হেন রাধা-দাস্য, সুধীর সম্পদ্,
কবে দিবে কৃপা করি'॥"

(চতুর্থাষ্টক)

"এ হেন রাধিকা-পদ, তোমাদের সুসম্পদ্,
দন্তে তৃণ যাচে তব পায়।
এ ভক্তিবিনোদ দীন, রাধা দাস্যামৃত-কণ,
রূপ-রঘুনাথ! দেহ তায়॥"

(পঞ্চমাষ্টক)

"এ হেন রাধিকা-চরণ-তলে।
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া বলে॥
তুয়া গণ-মাঝে আমারে গণি'।
কিঙ্করী করিয়া রাখ আপনি॥"

(সপ্তমাষ্টক)

"হেন রাধা-পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতিবিনোদ তাঁ'র মাগয়ে চরণ॥"

(অষ্টমাষ্টক)

শ্রীরাধাষ্টকের পরিশিষ্টে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীরাধার নাম-গানই রাগাত্মিক শ্রীরূপ-রঘুনাথানুগতানুগত-গণের একমাত্র স্বভাব বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীরাধার নাম-গানকে ভক্তিবিনোদ Sweet scented Ice-creamএর সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন।

"নবসুন্দর পীযূষ রাধিকা-নাম।
অতিমিষ্ট মনোহর তর্পণ-ধাম॥
কৃষ্ণনাম মধুরাদ্ভুত গাঢ় দুগ্ধে।
অতীব যতনে কর মিশ্রিত লুব্ধে॥
সুরভি রাগ হিম রম্য তঁহি আনি'।
অহরহ পান করহ সুখ জানি'॥
নাহি র'বে রসনে প্রাকৃত পিপাসা।
অদ্ভুত রস তুয়া পুরাওব আশা॥"

(শ্রীরাধাষ্টক-পরিশিষ্ট)

সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীরাধার নাম-সঙ্গীত নিরন্তর আস্বাদন করিলে কোন প্রাকৃত-পিপাসা থাকে না এবং অপ্রাকৃত উন্নত-উজ্জ্বল-রসের পরিতৃপ্তি ঘটে। পরিশিষ্টের ভণিতায় শ্রীভক্তি-বিনোদ শ্রীরাধা-জন শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নামের সেবা সম্ভব বলিয়া জানাইয়াছেন—

"দাস-রঘুনাথ-পদে ভক্তিবিনোদ।
যাচই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নাম-প্রমোদ॥"

গীতাবলীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম-গানে শ্রীগৌর-লীলা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ 'শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রে' মহাপ্রভুর লীলা বর্ণন করিয়াছেন। শতনাম-কীর্ত্তনেও সেইরূপ নিত্যানন্দের মুখে মহাপ্রভুর আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা কীর্ত্তন করাইয়াছেন—

"নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে গায় রে।
ভক্তিবিনোদ তাঁ'র পড়ে রাঙ্গা পায় রে॥"

ভক্তিবিনোদ মহাপ্রভুর একটী নাম করিয়াছেন—'মর্কট-বৈরাগী-দণ্ডী;' আরও কয়েকটী নামে ভক্তিবিনোদের মৌলিকত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। যথা— 'আর্য্যধর্ম্মপাল,' 'মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়-পাতা', 'কৃষ্ণতত্ত্ব-অধ্যাপক,' 'শ্রীনিবাস-গৃহ-ধন,' 'অন্তর্দ্বীপ-শশধর,' 'সীমন্ত-বিজয়' 'গোদ্রুমবিহারী,' 'মধ্যদ্বীপ-লীলাশ্রয়', 'কোলদ্বীপ-পতি,' 'ঋতুদ্বীপ-মহেশ্বর,' 'জহ্নু-মোদদ্রুম-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর,' 'নবখণ্ড-রঙ্গ-নাথ,' 'জাহ্নবী-জীবন', 'নগরকীর্ত্তন-সিংহ,' 'ভক্তদোষহন্তা' 'ভারতী-তারণ' 'নির্দ্দণ্ডী সন্ন্যাসী' 'স্বানন্দ-আস্বাদনানন্দী' ইত্যাদি।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার গীতাবলীতে অষ্টপ্রহর নাম-কীর্ত্তনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের বিংশোত্তর শতনাম আটটী স্তবকে গ্রথিত করিয়াছেন। মহাপ্রভুর শতনাম-গানে যেরূপ নিতাইর মুখে গৌর-নাম কীর্ত্তন করাইয়াছেন, এখানে তদ্রূপ ভক্তভাবাঙ্গীকারকারী গৌরের মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল নামের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রিয়নাম ও বিগ্রহের পরিচয়

পাওয়া যায়। ভক্তিবিনোদের বিগ্রহ—'স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জবিহারী,' 'রাধামাধব,' 'রাধাবল্লভ,' 'রাধারমণ,' 'রাধাবিনোদ,' 'রাধাকান্ত,' 'রাধারসিক,' 'রাধাপ্রমোদ,' 'রাধানাথ,' 'রাধাচরণামোদ,' 'রাধামিলনামোদ,' 'গিরিধারী,' 'যশোদানন্দন,' 'রাসরসানন্দ,' 'ব্রজজনরঞ্জন,' 'যমুনাতীর-বনচারী,' 'গোপীজনানন্দ' প্রভৃতি।

গীতাবলীতে শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের পদ্যানুবাদ-সঙ্গীতে শ্রীভক্তিবিনোদের অপূর্ব্ব মৌলিকত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। "চেতো-দর্পণ মার্জ্জনম্"—এই গৌর-মুখোচ্ছিষ্ট শ্লোকটী যেরূপ গুরু-গম্ভীর ও মাধুর্য্যৌদার্য্য-পরিপূর্ণ, ঠাকুরের—

"চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী॥"

প্রভৃতি পদসমূহও সেইরূপই পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্যের খনি।

"তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ, নাথ, ভাগ হামারা॥
নাহি জনমিল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর॥"

শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয়াষ্টকের এই কয়েকটী পদ বিরহ-সাগরের উপকরণ দিয়া লিখিত। প্রত্যেকটী পদ্যানুবাদেই ভক্তিবিনোদের রাগাত্মক-চিত্তবৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। অধিকারী পাঠকগণই তাহা পাঠ করিলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালার চতুর্থ গুটিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজেকে—"নামহট্টের পরিমার্জ্জক ঝাড়ুদার"—এই পরিচয় দিয়া শিক্ষাষ্টকের ঐ সকল সঙ্গীত প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঐ শিক্ষাষ্টক-সঙ্গীতের পূর্ব্বে সকলকে আহ্বান করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন—

"ভাই হে!

অনন্ত-কল্যাণ-গুণ-রত্নাকর চিদচিদ্বিশিষ্ট-পরম-মহেশ্বর পরব্রহ্ম পরমাত্মাবতারী সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হরি অপার-সংসার-সাগর-পতিত চিদ্বর্গের কল্যাণ-বিস্তার-করণাভিপ্রায়ে সর্ব্বাদৌ বেদ-স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরে সেই নিখিল শ্রুতির তাৎপর্য্য বিজ্ঞাপনার্থ নারায়ণ-নারদ-কপিল-ব্যাসাদি ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিখিল স্মৃতি-শাস্ত্র প্রচার করেন। পুনশ্চ স্বীয় অচিন্ত্য-লীলা-প্রচার-করণাভিপ্রায়ে নৃহরি-বামন-রাম-কৃষ্ণ-স্বরূপে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হন। কিন্তু ক্রমশঃ দুস্তর কলিকালরূপ মেঘাচ্ছন্ন হইলে জীবের চিত্তাকাশ অত্যন্ত কলুষিত হইল। তখন পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীনবদ্বীপ-ধামে শ্রীচৈতন্যচন্দ্ররূপে উদয় হইয়া জীব-নিচয়ের নিত্য-কল্যাণ-সাধনার্থ সর্ব্ববেদ-সার স্বীয় নামামৃত বর্ষণ করত কলি-পীড়িত জীবের সমস্ত অবিদ্যাক্লেশ দূর করিলেন। সেই সচ্চিদানন্দ শচীতনয় স্বীয় শ্রীমুখ-গলিত পরম পীযূষ-স্বরূপ শিক্ষাষ্টক জগজ্জীবকে বিতরণ করেন। সেই শিক্ষাষ্টক অদ্য আমরা গান করিয়া পরমানন্দ লাভ করি।"

বিবিধ সঙ্গীত

'শরণাগতি,' 'কল্যাণকল্পতরু,' 'গীতমালা,' 'গীতাবলী,' 'বাউল-সঙ্গীত,' 'দালালের গান' প্রভৃতি ব্যতীত শ্রীল ভক্তিবিনোদ 'প্রেম-প্রদীপ'-উপন্যাস ও 'জৈবধর্ম্মা'দি গ্রন্থের কয়েক স্থানে কতিপয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-সঙ্গীতের দ্বারা দুষ্ট মতবাদ-খণ্ডন-

কার্য্যও ভক্তিবিনোদের মহোপকারের একটী বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। 'শ্রীভজনরহস্যে' আটটী যামে অষ্টকালীন লীলাও ভক্তিবিনোদ পদ্যাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীব্রজমণ্ডলে ঐ সকল পদ্য সঙ্গীতাকারে কীর্ত্তন করাইতেন। ভজনরহস্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথ ও পূর্ব্ব মহাজন-গণের বহু শ্লোক ও শাস্ত্রের বহু শ্লোক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। সেই সকলও সময় সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সঙ্গীতাকারে কীর্ত্তন করাইতেন। সুতরাং তাহাও ঠাকুরের গীতি-সাহিত্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। ঠাকুর বিরাট্ পদ্য-সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য', 'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ', 'শ্রীনবদ্বীপ-শতক,' 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি' প্রভৃতি পদ্য-গ্রন্থ-সমূহ অনেক সময় সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব-পদকর্ত্তৃগণ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-সাহিত্যে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র পূর্ণ মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য, ঔদার্য্য ও সমচিত্তবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়। এজন্যই বোধ হয়, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার কল্যাণকল্পতরুর লালসাময়ী প্রার্থনার দ্বিতীয় সঙ্গীতে গাহিয়াছেন—

"কবে **নরোত্তম-সহ সাক্ষাৎ** হইবে।
কবে বা প্রার্থনা-রস চিত্তে প্রবেশিবে॥"

ঠাকুর নরোত্তম ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্পূর্ণ সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট। উভয়েই স্বরূপ-রূপানুগ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ তাঁহাদের রচিত গীতি-সমূহের মধ্যে অতি সরল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় অনেক কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন; কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার বিস্তৃত গীতি-সাহিত্যে সেই সকল কথাই নানাপ্রকার চিদ্‌বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া যেন ঠাকুর নরোত্তমের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার'ই বিবৃতি করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'কল্যাণকল্পতরু', 'শরণাগতি', 'গীতাবলী' 'গীতমালা' শ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কৃষ্ণদাস কবিরাজ-ঠাকুর নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত-পূর্ণ গ্রন্থরাজির বিবৃতি-গীতিরূপে প্রকাশিত। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের

গীতাবলীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের গীতি কিরূপ মাধুর্য্য, ঔদার্য্য ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ-ছন্দে পরিস্ফুট, তাহা অধিকারী পাঠক-মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রত্যেক গীতিতে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব জীব-দুঃখ-দুঃখিতা ও আচার্য্যত্ব পরিস্ফুট। ভক্তিবিনোদ আমাদিগের অনর্থ-ব্যাধি-সমূহকে যেন অতিমর্ত্ত্য রঞ্জনরশ্মি দিয়া নিভৃত অন্তঃপুর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়াছেন ও বিষাক্ত স্ফোটকগুলির যথাযোগ্য অস্ত্রোপচার করিয়াছেন।

গীতি-সাহিত্য কেবল উচ্ছ্বাসোদ্বেলিত ভাব-তরঙ্গের অভিব্যক্তি মাত্র,—এই আদর্শ ও মতবাদকে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচার-পূর্ণ গীতি-সাহিত্য বিপর্য্যস্ত করিয়া গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক কল্যাণরত্নের খনি আবিষ্কার করিয়াছে। ভক্তিবিনোদের কি গদ্য, কি পদ্য-সাহিত্য উভয়ের মধ্যেই শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয় বা বৈষ্ণব, তাঁহাদের আরাধ্য শ্রীগৌরসুন্দর, গৌরের ধাম, গৌরাভিন্ন বা শ্রীমদ্ভাগবতাভিন্ন হরিনামের অনুশীলনের অবিশ্রান্ত প্রবাহ প্রবাহিত রহিয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার গীতি-সাহিত্যের সিদ্ধিলালসা প্রভৃতিতে স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ হইয়াও আপনাকে সাধক-অভিমান করিয়া অমায়ায় শিক্ষা দিয়া জীবের মঙ্গলবিধান করিয়াছেন। ভক্তিবিনোদ নিত্যসিদ্ধ হইয়াও 'আমি সিদ্ধ হইয়াছি,—এরূপ কথা কখনও বলেন নাই। "আমি সাধক, কবে সেবাসিদ্ধি লাভ করিব"—এই বিচারের আদর্শই সর্ব্বত্র প্রকট করিয়াছেন। "গুরুদেব আমাকে সিদ্ধ-প্রণালী দিয়াছেন,

সুতরাং আমি সিদ্ধ হইয়া গিয়াছি বা আমি উচ্চাধিকারী”—এইরূপ প্রতিষ্ঠাশা যে সর্ব্বনাশকর, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতির প্রতি-ছত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতমালা, গীতাবলী প্রভৃতি গীতি-গ্রন্থের সহিত পাশাপাশি রাখিলে উভয় আচার্য্যেরই রূপানুগবরত্ব সমভাবে সম্প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে ঠাকুর নরোত্তম যেরূপ ‘প্রার্থনা’র স্বাভীষ্ট-লালসায় বলিয়াছেন—

“হরি হরি আর কি এমন দশা হ’ব।
ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ, কবে বা প্রকৃতি হ’ব,
তুহুঁ অঙ্গে চন্দন পরা’ব।”

অপর দিকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদও শরণাগতিতে গাহিয়াছেন—

“ছোড়ত পুরুষ-অভিমান।
কিঙ্করী হইনু আজু কান॥
বরজ-বিপিনে সখী সাথ।
সেবন করহুঁ রাধানাথ॥”

ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন—

“মল্লিকা-মালতি-যূথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি’,
কবে দিব দোঁহার গলায়।”

আবার অন্যদিকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্ব্বত্র গুরুরূপা সখীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া বলিতেছেন—

"কুসুমে গাথবুঁ হার।
তুলসী মণিমঞ্জীর তার॥
যতনে দেওবঁ সখী-করে।
হাতে লওব সখী আদরে॥
সখী দিব তুয়া দুহুঁক গলে।
দূরত হেরবুঁ কুতূহলে॥"
(শরণাগতি—২৪)

ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনায় গাহিতেছেন—

"ধন-জন-পুত্র-দারে, এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যা'ব।
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি',
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥
যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ড-জলে, স্নান করি' কুতূহলে,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া।"

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরুর লালসাময়ী প্রার্থনায় সেই রাগিণীতেই গাহিয়াছেন—

"কবে হেন শুভদিন হইবে আমার।
মাধুঁকরী করি' বেড়াইব দ্বার দ্বার॥
যমুনা-সলিল পিব অঞ্জলি ভরিয়া।
দেব-দ্বারে রাত্রিকালে রহিব শুইয়া॥"

ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনায় গাহিয়াছেন—

"ভ্রমিব দ্বাদশ-বনে, রসকেলি যে-যে স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ-স্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া॥"

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরুর লালসাময়ী প্রার্থনায় সেইরূপ ভাবেই গাহিয়াছেন—

"কাঁদিতে কাঁদিতে আমি যা'ব বৃন্দাবন।
ব্রজধামে বৈষ্ণবের লইব শরণ॥
ব্রজবাসী সন্নিধানে যুড়ি দুই কর।
জিজ্ঞাসিব লীলাস্থান হইয়া কাতর॥
ওহে ব্রজবাসি! মোরে অনুগ্রহ করি'।
দেখাও কোথায় লীলা করিলেন হরি॥"

ঠাকুর নরোত্তমের—

"বৈষ্ণব-চরণ-জল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত॥"

আর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতির—

"শুদ্ধভকত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা পরমসিদ্ধি প্রেমলতিকার মূল॥"

গীতি উভয়ের সমচিত্তবৃত্তির পরিচায়ক। এদিকে গৌর-জন ঠাকুর নরোত্তম যেমন গাহিয়াছেন—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস।"

সেইরূপ গৌর-জন ঠাকুর ভক্তিবিনোদও গাহিয়াছেন—

"গৌড়-ব্রজ-জনে ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥"

এদিকে ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন—

"হরি হরি! আর কি এমন দশা হ'ব।
কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব॥
যাবটে আমার কবে, এ পাণি-গ্রহণ হ'বে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাঁহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তাঁ'র পায়॥"

অপরদিকে আবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শরণাগতিতে আরও বিস্তৃত করিয়া গাহিয়াছেন—

"দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে,
নিজ-স্থূল পরিচয়।

নয়নে হেরিব, ব্রজপুর-শোভা,
নিত্য-চিদানন্দময় ॥
বৃষভানুপুরে, জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হ'বে।
ব্রজগোপী-ভাব, হইবে স্বভাব,
আন ভাব না রহিবে ॥
নিজ-সিদ্ধদেহ, নিজ-সিদ্ধনাম,
নিজ-রূপ স্ববসন।
রাধাকৃপা-বলে, লভিব বা কবে,
কৃষ্ণপ্রেম প্রকরণ ॥"

শ্রীরূপানুগবর উভয় ঠাকুরের এই লালসাময়ী প্রার্থনা-সমূহ একই তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট হইয়াও উভয়ের গীতির মধ্যে এমন এক মৌলিকত্ব, বৈশিষ্ট্য ও নিজত্ব রহিয়াছে যে, তাহা সেই ভাবের অনুসরণকারী ব্যতীত অপরে অনুভব করিতে পারিবেন না। ভক্তিবিনোদ-ধারায় অবগাহন-স্নান না করিলে ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনা শতশতবার পাঠ করিয়াও উহার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি হয় না, বরং হিতে বিপরীত ফল ফলে—প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া যাইতে হয়। ভক্তিবিনোদ-ধারা ত্রিবেণী-ধারার ন্যায় ভক্তি-গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সম্মেলন করিয়াছে। গৌর-জন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শুদ্ধভক্তিগঙ্গা পুনঃ প্রবাহিত করিয়াছেন; থানেশ্বরী জগন্নাথের পুনরবতার বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ-প্রভু শ্রীল গৌরকিশোর-প্রভুকে ব্রজমণ্ডল হইতে নবদ্বীপ-মণ্ডলে আনয়ন করিয়া শুদ্ধভক্তি-

গঙ্গার অমৃত-প্রবাহের সহিত যামুনসেবা-প্রবাহের সখীত্ব লাভ করাইয়াছেন, আর শ্রীক্ষেত্রে অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী ক্ষেত্র-মণ্ডল হইতে গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়া ঐ দুই ধারার সহিত মিলিত হইয়া 'ত্রিধারা' প্রকট করিয়াছেন।

ঠাকুর নরোত্তম—

"ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার॥"

* * *

"এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই॥"

প্রভৃতি বাক্যে বৈষ্ণব-চরণে বিজ্ঞপ্তি শিক্ষা দিয়াছেন, আবার অন্যদিকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরুর দৈন্যময়ী প্রার্থনায়—

"গলেবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ ধরি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হইতে মাগিব বিশ্রাম॥"

অথবা—

"কৃপা কর বৈষ্ণব-ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে ভজিতে
অভিমান হ'বে দূর॥"

কিংবা—

"বৈষ্ণব-ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া, শোধহ আমারে,
তোমার চরণ ধরি ॥"

প্রভৃতি গীতির মধ্যে আশ্রয়-বিগ্রহের আশ্রয় ব্যতীত কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই,—ইহা পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন। ইহা দ্বারা উভয় ঠাকুরের শ্রীরূপানুগবরত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এখানেই উভয় ঠাকুরের শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা-প্রচার-সেবার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রক্তক-পত্রক-চিত্রক, সুদাম-শ্রীদাম-সুবলাদি, নন্দ-যশোদাদি, ব্রজগোপীগণ—সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রসে বৈষ্ণব-ঠাকুর। সেই সকল বৈষ্ণব ঠাকুরের চরণাশ্রয় ব্যতীত কৃষ্ণপ্রাপ্তির "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে"। ইহারই নাম—শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার গীতি-সাহিত্যে 'বৈষ্ণব'-শব্দটীর পূর্ব্বে অধিকাংশ স্থলেই 'ঠাকুর' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—"ঠাকুর বৈষ্ণব", আর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—"বৈষ্ণব ঠাকুর"। উভয়ই একই তাৎপর্য্যপর।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কল্যাণকল্পতরুতে কেবল যে পূর্ব্ব-মহাজনগণের পদাবলীর অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে; তাঁহার প্রত্যেকটি গীতিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা-সার পাওয়া যায়—

"দুর্ল্লভ মানব-জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু—দুঃখ কহিব কাহারে ॥"

প্রভৃতি গীতি শ্রীমদ্ভাগবতের "লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে" (ভাঃ ১১।৯।২৯) প্রভৃতি শ্লোকেরই বিবৃতি। আবার কল্যাণ-কল্পতরুর অভিধেয়-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধির—

"সামান্য বৈদিকধর্ম্ম অর্থ-ফলপ্রদ।
অর্থ হৈতে কাম লাভ মূঢ়ের সম্পদ ॥"

প্রভৃতি পদ গীতার "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা" (গীঃ ২।৪৫) প্রভৃতি শ্লোকের তাৎপর্য্য-সার। "নরতনু ভজনের মূল"—ঠাকুর মহাশয়ের এই উক্তির কদর্থ করিয়া বা চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীর "সবার উপরে মানুষ বড়"—এই পদের বিকৃতার্থ করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-মতবাদের পূতিগন্ধপূর্ণ যে দেহাত্ম-বুদ্ধিকে বহু মানন করা হইতেছিল—

"শরীরের সুখে মন দেহ জলাঞ্জলি।
এ দেহ তোমার নয়, বরঞ্চ এ শত্রু হয়,
সিদ্ধ-দেহ সাধন-সময়ে।
সর্ব্বদা ইহার বলে রহিয়াছ বলী ॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কল্যাণকল্পতরুর নির্ব্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধির এই পঞ্চম সঙ্গীত তাহার উপর সম্পূর্ণ লগুড়াঘাত করিয়াছে।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ব গীতি-সাহিত্য-রচয়িতা মহাজনগণ, মালাধর বসু, গুণরাজ খাঁ প্রভৃতি পদ্যানুবাদ-

প্রণেতা শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ব গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণ অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী যুগের বহু পদাবলী বা গীতাবলী-সাহিত্য-রচয়িতৃগণের গীতি-সাহিত্যসমূহে লীলাকথাই বিশেষভাবে বর্ণিত হওয়ায় কাম-ক্রোধাসক্ত, অত্যন্ত দেহ-গেহাসক্ত অনর্থযুক্ত জীব কেবল কাব্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কিংবা অনর্থগ্রস্তাবস্থায় ও অপকাবস্থায় মুক্তকুলের অনুশীলনীয় ব্যাপার-সমূহ আলোচনা করিতে গিয়া অত্যন্ত অনর্থ ও অপরাধগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ঠাকুর নরোত্তমের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র কতিপয় গীতিতে অনর্থ-রোগ-বিনাশের অনেক উপদেশ থাকিলেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-সাহিত্যে সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা অতি বিশদভাবে ও নানাপ্রকার বিশ্লেষণ, বিচার ও যুক্তির সহিত বিবৃত হইয়াছে। সমসাময়িক প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজের দুরবস্থা; বহু প্রকার অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতির কৃষ্ণ-বিমুখতা-বৈচিত্র্য; ক্লীব-নির্গুণ-সগুণ-সংশয়বাদীর, পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার নবীন বিলাস-তরঙ্গে ও বহুরূপী বহির্ম্মুখ-চিত্তবৃত্তিতে পরিপ্লাবিত জীব-জগতের পতনাবস্থা দেখিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার গীতি-সাহিত্যের মধ্যে প্রচুর সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে যেরূপ সর্ব্বতোমুখী বিশ্লেষণ-যুক্তির সহিত বিবৃত করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। কাজেই যাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গীতি-সাহিত্যের বাস্তব-অনুশীলন করিতে গিয়া কেবল ঠাকুর নরোত্তমের 'প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' পর্য্যন্ত অধ্যয়ন সমাপ্ত করিবেন কিংবা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-সাহিত্য-সমূহ অনুশীলন না করিয়াও শুদ্ধ-

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মে বা রূপানুগ-ধারায় প্রতিষ্ঠিত থাকা যায় মনে করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্য-প্রেমামর-তরুর সুফল-আস্বাদনে বঞ্চিত হইবেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমগ্র পারমার্থিক সাহিত্যরাজি কেবলমাত্র পূর্ব্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সাহিত্যের পরিশিষ্ট-মাত্র নহে; বস্তুতঃ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অপ্রাকৃত-সাহিত্য-মন্দিরের সেবা ব্যতীত বর্ত্তমানে বিশ্বের কেহই আপনাকে "গৌড়ীয়" বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান বা শ্রীরূপানুগ-ধারায় প্রবেশই করিতে পারিবেন না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, যাঁহারাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সাহিত্য ও তদনুগামী গৌড়ীয়-সাহিত্যের অনুশীলন হইতে নিজদিগকে পৃথক্ রাখিয়া অন্যান্য পূর্ব্বাচার্য্যগণের সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই বর্ত্তমানে নানাপ্রকার প্রাকৃত-সাহজিক-মতবাদ, সিদ্ধান্ত-বিরোধ, রসাভাস-দোষ ও শুদ্ধভক্তি-বিরুদ্ধ বিচারে বিভ্রান্ত হইয়া শুদ্ধ-রূপানুগ-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সন্ধান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের সঙ্গীত-সমূহ বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সম্মত হইলেও অনধিকারী ব্যক্তি স্থান-কাল-পাত্রের বিচার পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল সঙ্গীত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদির লোভে যেখানে-সেখানে অবৈধভাবে ব্যবহার করিয়া জগতে নানাপ্রকার পাপ, ব্যভিচার ও অপরাধের স্রোত আনয়ন করিয়াছিল। শ্রীভক্তিবিনোদের সমসাময়িক যুগের প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের রচিত যাত্রা-গান, পালা-গান প্রভৃতিতে নানাপ্রকার ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ ও

রসাভাস-দোষ দেখা গিয়াছিল। এইজন্য আমাদের ঠাকুর লীলা-কীর্ত্তন অপেক্ষা সম্বন্ধজ্ঞান-তত্ত্বের বিচারপূর্ণ সঙ্গীতই অধিক রচনা করিয়াছেন এবং লীলা-কীর্ত্তনের মধ্যেও সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রচলিত সঙ্গীত-সাহিত্য ও কীর্ত্তন-প্রণালী-সম্বন্ধে যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধার করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উপসংহার করিতেছি।

"আজকাল অনেকগুলি কীর্ত্তন-সম্প্রদায় হইয়াছে। ইহারা আপনাদের সঙ্গীতকে "মনোহরসাহী সঙ্গীত" বলিয়া উল্লেখ করে। ইহাদের গানের প্রথা এই যে, প্রথমে আসরে বসিয়া খোল বাজায়, পরে সুর সাধিয়া লয়। সুর-সাধন হইলে একটী গৌরচন্দ্র-সম্বন্ধীয় গীত গায়। গৌরচন্দ্রের যে রসের গীত হয়, সেই রসের কৃষ্ণলীলা একটী পালা-গান হয়। যে-সময়ে গৌরচন্দ্রের গীত হয়, তখন গায়ক, বাদক ও শ্রোতৃগণ দণ্ডায়মান থাকেন। গৌর-গীত সমাপ্ত হইলে সকলে বসিয়া কৃষ্ণ-গীত গান ও শ্রবণ করেন। পালাগুলি পূর্ব্ব-মহাজন-কৃত গীতে পরিপূর্ণ। যে গৃহস্থ ঐ গানের অনুষ্ঠান করান, তিনি মালা-চন্দনের ব্যবস্থা করিয়া প্রথমে মালা মৃদঙ্গের উপর দিয়া তৎপরে গায়ক, বাদক ও শ্রোতৃবর্গকে মালা-প্রদান করেন।

যদিও এই সঙ্গীতের নাম সাধারণে মনোহরসাহী হইয়াছে, তথাপি অনুসন্ধান করিয়া জানা যায়, সকল গানই মনোহরসাহী নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে এই-

রূপ কীর্ত্তন-গানের বীজ পত্তন হয়। কিন্তু সে-সময় গানের এরূপ পারিপাট্য হয় নাই। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সময়ে গানের পারিপাট্য হয়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম দাস ও শ্রীশ্যামানন্দ—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীবগোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিন জনেই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতি-বিদ্যায় তিন জনেই পারদর্শী। তিন জনেই পরস্পর এক প্রাণ, একাশয় ও হৃদয়-বন্ধু। কিন্তু উক্ত তিন মহাত্মা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক। শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য কাটোয়া-প্রদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।তাঁহার প্রদেশটী মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম—'মনোহরসাহী-গান'। শ্রীনরোত্তম দাস রাজসাহী জেলার গরাণ-হাটী বা গড়ের হাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামের অধিবাসী। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম—'গরাণহাটী গান'। শ্রীশ্যামানন্দ মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁহার প্রবর্ত্তিত গীত-পদ্ধতিকে 'রেণেটি গান' বলা যায়। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্যকে 'প্রভু'-পদ, শ্রীনরোত্তম দাসকে 'ঠাকুর'-পদ ও শ্রীশ্যামানন্দকে 'প্রভু'-পদ দিয়াছিলেন।

শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে উৎসাহিত হইয়া গীতাচার্য্যত্রয় আপন আপন প্রদেশে গমন করিলেন। ঐ তিন মহাত্মা গৌড়-ভূমির অলঙ্কার। তাঁহারা গোস্বামীদিগের ন্যায় সংস্কৃত-বিদ্যায় অধিক পণ্ডিত ছিলেন,—এরূপ বোধ হয় না; কেন না, তাঁহাদের

বিরচিত কোন সংস্কৃত-গ্রন্থ দেখা যায় না। তাঁহারা ব্রজ-রস-ভজনে পরিপক্ক, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে পারঙ্গত ও গান-বিদ্যায় বিশারদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতে একটু উপপ্লব হইয়াছিল। তখন প্রভু-বংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় এবং নানা মতবাদ প্রবেশ করায় গৌড়-ভূমি আচার্য্য-শাসন-রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু বীরচন্দ্রের স্বতন্ত্র-স্বভাব-বশতঃ সমস্ত গৌড়-ভূমিকে তিনি আয়ত্তাধীনে আনিতে পারেন নাই। শ্রীল অদ্বৈত-সন্তানের মধ্যে তখন বড় গোলযোগ। মহাপ্রভুর পার্ষদ মহান্তগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কুপন্থী প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-নামে সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস। স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদের দোহাই দিয়া উহারা দুর্ভাগা জীবদিগকে কুপন্থা শিখাইতে লাগিল। শ্রীজীবগোস্বামী তখন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি ব্রজবাসী থাকায় গৌড়-মণ্ডলের শোচনীয় অবস্থা-শ্রবণে সুদুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গৌড়-ভূমির ধর্ম্ম-সংস্কারক আচার্য্য-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পরিকরকৃত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ-সকল গৌড়-ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঐ সমস্ত গ্রন্থ পথ-মধ্যে অপহৃত হইল। প্রেরিত প্রচারকগণ নিগ্র্ন্থ হইয়া নিজ-নিজ ভজন-বলে আপন আপন গীত-পদ্ধতি অবলম্বন-পূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে গানের পদ্ধতিত্রয় স্ব-স্ব প্রদেশে প্রবলরূপে প্রচারিত হইল। আচার্য্যত্রয় মধ্যে মধ্যে খেতুরি, বিষ্ণুপুর, নবগ্রাম, গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে দেবপ্রতিষ্ঠাদি-কার্য্য-উপলক্ষে একত্রিত হইয়া পরস্পর বিচার ও যুক্তি করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের প্রযত্নে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইল, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচার হইতে লাগিল। উক্ত তিন প্রচারক গৌড়-ভূমির প্রধান অলঙ্কার ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কলিকাল এরূপ ভয়ানক যে, সৎকার্য্যের বহুদিন স্থিতি করিতে দেয় না। উক্ত আচার্য্যত্রয় ও তাঁহাদের অনুচর শ্রীগোবিন্দ দাসাদি মহাজনগণের অদর্শনের সঙ্গে-সঙ্গে পরমধর্ম্ম পুনরায় বিপ্লুত হইতে লাগিল। গৌড়-ভূমি হইতে শুদ্ধভক্তির বিচার উঠিয়া যাইতে লাগিল। বৈষ্ণবই হউন, শাক্তই হউন বা কর্ম্মকাণ্ডীই হউন, আচার্য্য-বংশীয়গণ বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায্য প্রচারক বলিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কাজে-কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দাদ্বৈত ও তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। এদিকে এইরূপ আচার্য্য-বিপ্লব ; আবার বাউল, সহজিয়া প্রভৃতির উপদ্রব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইল। শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের দুর্দ্দশা এই সব কারণে আজ পর্য্যন্ত প্রতীয়মান।

সংসারে এবম্ভূত অবস্থায় বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ মায়াবাদকেই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বলিতেছেন, কেহ কেহ শুদ্ধধর্ম্মের একটু অঙ্গ লইয়া তাহাতে মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদ মিশাইয়া একপ্রকার বিকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

যাঁহারা নিরীহ, তাঁহারা "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥"—এই ন্যায় অনুসারে কনিষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধিমান্ শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিতান্ত অভাব। শিক্ষকের অভাব হইলে জীবের যে গতি হয়, তাহাই আজকাল গৌড়-মণ্ডলের অবস্থা। অন্যান্য বিষয়ে যে-সকল দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার অলোচনার অবসর এস্থলে নাই। * *

গরাণহাটী-কীর্ত্তন আজকাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। প্রকৃত মনোহরসাহী কীর্ত্তন কেহ কেহ জানেন। প্রকৃত মনোহরসাহী কীর্ত্তনে নূতন অক্ষর দেওয়ার পদ্ধতি নাই। মহাজনগণ যে অক্ষর গানে সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহাই মাত্র গীত হয়। মনোহরসাহী গীতের অপূর্ব্ব ধারা। দুই চারিবার সুর ফিরাইয়া পদটী গান করিতে করিতে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে ভাব সঞ্চার হয়। মহাজনের বাক্যে রসাভাস ও বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নাই। অরসজ্ঞ ব্যক্তি বা গায়ক অক্ষর সংযুক্ত করিলে কাজে-কাজেই রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অতিশয় গম্ভীর। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম যাঁহারা অধিকদিন সাধুসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত হইবে না। বৈষ্ণব-রসও পরম-গম্ভীর। অধ্যাপকদিগের জড়ালঙ্কারের রস ও চিন্ময় বৈষ্ণবালঙ্কারের রস স্বভাবতঃই পৃথক্। ব্যবসায়ী গায়কগণ প্রকৃত সাধুসঙ্গ করেন নাই, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তও ভালরূপ জানেন না। অতএব তাঁহাদের অক্ষরগুলি বৈষ্ণব-কর্ণে বজ্রাঘাতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। মনোহরসাহী গান অল্প লোকেই গাহিয়া থাকেন। তাঁহাদের গান

শ্রবণ করিলে শ্রবণ জুড়াইয়া যায়। ওস্তাদজী বৈষ্ণবদাসের দেহান্তরের পর শ্রীকুলিয়া-নবদ্বীপে শ্রীঅদ্বৈতদাস এবং লাখুরিয়া-নিবাসী রাগভূষণ শ্রীরসিকলাল দত্ত তথা রঙ্গপুর নিবাসী শ্রীবরদা-প্রসাদ বাগ্‌চী মহাশয় প্রভৃতি এখনও মনোহরসাহী গানকে বজায় রাখিয়াছেন। ইঁহাদিগের গান শুনিয়া যাঁহারা একবার রসবোধ করিয়াছেন, তাঁহারা অর্থ-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়পতি গায়কদিগের গান শুনিতে আর স্পৃহা করেন না। আজকাল অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কগণ কেবল রেণেটী-পদ্ধতির রং গান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদিগের ভিতর মান বজায় রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে একটা একটী পাকা গান গাহিয়া থাকেন। আর সকলেই নামে রসিক-মাত্র। তাহারা রসবোধশূন্য এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধভাষী। গানে তাহাদের রাগ-রাগিণী, রং ঢং যথেষ্ট আছে, কিন্তু বৈষ্ণবের শ্রোতব্য অধিক দেখা যায় না। তাহারা সমাগত স্ত্রীলোক ও মূর্খলোকদিগকে রঞ্জন করিবার মানসে গানে এতদূর আখর দেয় যে, মহাজনের পদটী কোথায় থাকে, তাহা জানা যায় না। মুর্খ লোক বাহবা দেয়, অর্থ দেয়, তাহাতেই তাহারা অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। আঠার রসের কালাকাল বিচার নাই। বৈষ্ণব-তত্ত্বে নিশান্ত-লীলা সর্ব্বপ্রথমে হওয়া উচিত। এই অসাধুরঞ্জকগণ নিশান্ত লীলা অবশেষে গায়। ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। আর একটি কথা ইহার মধ্যে ভয়ানক আছে। শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গার-লীলা গীত ও শ্রবণ, উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্য-ভজন। এই ভজন-লীলা সর্ব্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত

ও অপরাধ। "আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা।"—এই আচার্য্য-বাক্য বিশ্বাস করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কদিগের মুখে রসগান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে। বিগত গানোৎসবে বীরভূমস্থ কোন মহাত্মা বৈষ্ণব শ্রীকুলিয়া-নবদ্বীপে গান শুনিতে গিয়াছিলেন। তথায় সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর নিকট সম্ভোগ-রসের গান হইতেছিল। তচ্ছ্রবণে তিনি ভীত হইয়া চলিয়া গেলেন। গায়ক ও শ্রোতাদিগের এইরূপ অপরাধ-ক্রিয়া আজকাল নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িয়াছে। জগতে অধিকাংশ মনুষ্য বিকৃত। তাহারা রং ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেচ্ছাচার করিয়া থাকে। যে-পর্য্যন্ত এই কুপন্থা স্থগিত না হইবে, সে-পর্য্যন্ত শৃঙ্গার-রসের গাম্ভীর্য্য থাকিবে না। হে ভক্তবৃন্দ! স্বার্থপর গায়ক ও জড়ানন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় আপনারা রস-গান শ্রবণ করিবেন না। শ্রাদ্ধ-সভা ত' দূরে যাউক, বৈষ্ণবদিগের আখ্ড়ায় এ পদ্ধতি যাঁহাতে না থাকে, তাহার যত্ন করুন। সর্ব্ব-প্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্য রসের গান হওয়া উচিত। যেখানে অমিশ্র শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণব-মাত্র উপস্থিত, সেখানে রস-গান শ্রবণ করুন এবং রসগান-শ্রবণ-সময়ে নিজ-সিদ্ধ-স্বরূপোচিত ভজন-ভাব অনুভব করুন। ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায়, যাউক; তাহাতেও বৈষ্ণব-দিগের মঙ্গল হইবে। অর্থলোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রস-গানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।" —(সজ্জনতোষণী ৬ষ্ঠবর্ষ, ২য় সংখ্যা)